ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাঃ
সংক্ষিপ্ত
ইতিহাস

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব
এম. এ. বি. এ. (অনার্স)
পরিচালক
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

এ. এস. এম. আলাউদ্দীন
এম. এম. বি. এস. এস. অনার্স এম. এস. এস.
রিসার্চ স্কলার
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

প্রকাশনায় ঃ ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
৭৩, আউটার সার্কুলার রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩১৮৬১১, ৪১৬৯১৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন- ১৯৯৯ ঈসায়ী

২য় সংস্করণ ঃ আগস্ট- ২০০২ ঈসায়ী
জমাদিউস সানি ১৪২৩ হিজরী
ভাদ্র ১৪০৯ বাংলা

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

কম্পোজ ঃ আই. ই. এস. কম্পিউটার সেন্টার
৭৩, আউটার সার্কুলার রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

Islami Shikkha Bebostha : Sangkhipta Itihas (A Brief History of Islamic Education System) Written by Principal Md. Abdur Rob & A.S.M. Alauddin, Published by Islamic Education Society, Dhaka-1217. **Price : Tk. 60.00**

প্রকাশকের কথা

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও শিক্ষা সাহিত্যের বিস্তারে মুসলমানদের অবদান ও ভূমিকা অবিস্মরণীয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল স্তর ও বিভাগে মুসলমানদের রয়েছে এক সোনালী অতীত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচনা মুসলমানদের হাতেই হয়েছিল। আজ সারা দুনিয়াব্যাপী ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে, মানুষের মাঝে ইসলামী জীবনাদর্শকে জানা ও বুঝার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সবচাইতে বড় আকাঙক্ষার বিষয় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির পক্ষ থেকে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন সুধী জনের পরামর্শের ভিত্তিতে তাতে আরো কয়েকটি বিষয় যোগ করা হয়। সোসাইটির রিসার্চ স্কলার এ এস এম আলাউদ্দিন, সোসাইটি পরিচালকের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ আনজাম দিয়েছেন। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম ও আব্বাস আলী খান পাণ্ডুলিপি খানা পড়েন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দেন।

পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় বিভিন্ন বই পুস্তক থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। আরো অনেকের কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। তাদের মধ্যে অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ, অধ্যাপক মুঃ মুজাম্মেল হক, মুঃ আবদুল হালিম, মুঃ আবদুল মালেক পাটওয়ারী ও মুঃ আজীজুর রহমান-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা তাদের সবার নিকট কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশ করতে আরো যারা সহযোগিতা করেছেন আমরা তাদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে তাদের সর্বোত্তম জাযা কামনা করছি।

বইটিতে কোনপ্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ করছি। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুণ। আমীন।

(অধ্যক্ষ) মুহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

সূচীপত্র

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মহানবীর আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনাদর্শ। এ আদর্শের ভিত্তিতে মানব জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী -রাসূলগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আঃ) প্রথম মানুষ, প্রথম নবী। হযরত আদম (আঃ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত প্রত্যেক নবীই অহী পেয়েছেন। অহীই ছিল তাঁদের শিক্ষাদানের মূল ভিত্তি।

আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে শ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন দান করেন। আল কুরআন মানুষের ইহকালীন এবং পরকালীন জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্বন্ধে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। আল কুরআনের এ নির্দেশনাকে বাস্তবে রূপদান করেছেন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)।

তিনি মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে একটি ঘুমন্ত, চরম জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন কিভাবে? কোন পরশমনির ছোঁয়া তাদেরকে বিশ্ব বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে শক্তি ও সাহস জোগাল?

বস্তুত "ইকরা" পড়, জ্ঞান অর্জন কর– আল্লাহ তায়ালার এ প্রথম "অহী"র পথ ধরেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সামনে অগ্রসর হন এবং বিজয় লাভ করেন।

বাস্তবে মানব জাতিকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্যই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে আল্লাহ পাঠায়েছেন। তাঁর উপর সর্বপ্রথম অহী নাজিল হয়।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۔ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۔

অর্থঃ পড়ো (হে নবী) তোমার রবের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, অতি দয়ালু তোমার রব যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতনা।

আল কুরআনের এ আয়াতগুলোতে শিক্ষার প্রধান দুটি দিকের উল্লেখ আছে। তা হল পড়া এবং লেখা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে 'পড় বা শিক্ষা গ্রহণ কর' আদেশের মধ্যেই নিহিত আছে সকল মানুষের প্রতি শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা প্রদান বা বিস্তার ও শিক্ষার সকল কর্মকান্ড সম্পন্ন করার নির্দেশ।

মহানবী (সাঃ) বলেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থঃ জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য কাজ। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)। তিনি আরো বলেন ঃ

اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ

অর্থঃ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করতে থাক।

আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সাঃ) কে মানব জাতির শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) নিজেই বলেছেন–

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا অর্থঃ আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

রাসূল (সাঃ) এর অগণিত সাহাবী ছিলেন। আর সাহাবাগণ প্রত্যেকেই ছিলেন তৎকালীন সমাজের এক একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। সেই যুগে কোন সমাজে এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত লোক থাকা ছিল কল্পনাতীত।

নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান দান করার জন্য তিনি শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদের কাজে নিয়োজিত করতেন। বদর যুদ্ধের কয়েদীরা এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ। বদরের যুদ্ধে সত্তর জন অমুসলিমকে গ্রেফতার করে মদিনায় আনা হয়।

তখন তাদের মাঝে যারা লেখাপড়া জানতেন ফিদিয়া হিসেবে তাদেরকে মাথা পিছু দশ জন নিরক্ষর লোককে লেখাপড়া শিক্ষা দেয়ার কাজে নিয়োজিত করা হয়।

শিক্ষিত লোকদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ছিল নিরক্ষর লোকদের শিক্ষিত করে তোলা। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'ইলম শিক্ষা কর এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দাও।'

মসজিদ ও বাসস্থান কেন্দ্রীক শিক্ষা

বর্তমানকালের মত মহানবী (সাঃ) এর সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যাপক বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। তখন মসজিদই ছিল শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। বর্তমান সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকল্প ছিল এ মসজিদ। ব্যক্তি বিশেষের বাড়িও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা হত।

মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) এর বাসস্থানই ছিল শিক্ষা কেন্দ্র। ইহাই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এই বাড়িটি ইতিহাসে দারুল আরকাম নামে পরিচিত। মহানবী (সাঃ) ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), যায়েদ (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ) ও বিলালের (রাঃ) মত মহান সাহাবীগণ ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। মহান আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ছিল তাঁদের পাঠ্যপুস্তক।

মদীনার শিক্ষা প্রকল্প– সুফ্ফার শিক্ষায়াতন

মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসার পরই মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। মহানবী (সাঃ) মদীনায় পৌঁছে সর্ব প্রথম মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। তিনি এর একটি অংশ শিক্ষায়তন হিসেবে নির্দিষ্ট করেন। এটাই সুফ্ফা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটাই ইসলামের প্রথম জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়। নবী (সাঃ) ছিলেন এর প্রধান। যুদ্ধ, রাজনীতি, সমাজ সংস্কার এবং নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করার কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি একটা উল্লেখযোগ্য সময় শিক্ষকতায় ব্যয় করতেন।

সুফ্ফার লোকদের শিক্ষা দানের জন্য কোন কোন সময় যায়েদ ইবনে সাবেত, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ, ইবনুল আস, উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)কে কাজে লাগাতেন।

সুফ্ফার ব্যবস্থাপনা

রাসূল (সাঃ) নিজেই সুফ্ফার যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করতেন। পরে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ)কে শিক্ষা বিভাগ দেখাশোনা করার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। রাসূল (সাঃ) ছাত্রদেরকে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করতেন। লেখাপড়া ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। শিক্ষকরাও কোনরূপ পারিশ্রমিক নিতেন না। এমনকি কোন ছাত্রের কাছ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করা পর্যন্ত ছিল নিষিদ্ধ।

শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার ব্যাপারে মদীনার আনসারদের কোন জুড়ি ছিল না। তাঁরা সম্ভাব্য সকল উপায়ে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতেন।

দূর-দূরান্ত হতে ছাত্ররা এসে এখানে শিক্ষা লাভ করত এবং পুনরায় নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেত এবং বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতো। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এ শিক্ষায়তনে শিক্ষা লাভ করার জন্য তাঁদের অঞ্চল হতে প্রতিনিধিও প্রেরণ করতেন।

ইসলাম গ্রহণের পর একজন ঈমানদারের প্রধান কাজ হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা। সঠিক জ্ঞান অর্জন ছাড়া কোন আদর্শ বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়াও এ বিষয়ে একদল বিশেষজ্ঞও তৈরী হওয়া দরকার যারা শিক্ষাদান করা ও সব প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত জ্ঞানের অধিকারী হবেন। কুরআন শরীফে সূরা তওবায় ১২২ আয়াতে এ বিষয়টিই এভাবে ব্যক্ত হয়েছে

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ
وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَارَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ○

অর্থ ঃ আর তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশ থেকে এমন একদল

লোক কেন বের হলো না যারা দ্বীনের ব্যাপারে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করার পর নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে জনগণকে সতর্ক করতো, যাতে তারা অনৈসলামিক আচরণ থেকে বিরত থাকে।

তাঁরা সেখান থেকে শিক্ষা লাভ করে গোত্রের লোকদের নিকট ফিরে আসতেন এবং তাঁদের লেখাপড়া শেখাতেন। এভাবে সুফ্‌ফা মদীনার কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

শিক্ষার পাঠক্রম

রাসূল (সাঃ) এর সময়ে শিক্ষার পাঠক্রম মূলত এবং প্রধানত কুরআন ও হাদীসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে পাঠক্রম সীমাবদ্ধ থাকলেও এর আওতা ছিল ব্যাপক। তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাতের নিয়ম-কানুন, যাকাতের বিধান,ব্যবসা সংক্রান্ত আইন, বিবাহ-তালাক ও মীরাসী আইন, চুক্তি ও সাক্ষ্য আইন, যুদ্ধ কৌশল ও নীতিগত বাধ্যবাধকতা, বিচার বিভাগীয় আইন-কানুন, প্রশাসনিক ও আন্তর্জাতিক আইন, সমাজ কল্যাণ, অর্থনীতি, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক শিষ্টাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পানাহারে হালাল-হারামের সীমারেখা, শিকার, মেহমানদারী, রোগীর পরিচর্যা, পারস্পরিক আচার-ব্যবহার, পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার আত্মীয়-অনাত্মীয়, প্রতিবেশী, এতিম, মিসকীন, পথিক মুসাফিরের প্রতি আচরণ, ক্ষুধার্থকে অন্নদান ইত্যাদি বিষয়ও তার অন্তর্ভূক্ত ছিল। অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস সম্পর্কেও আলোকপাত করা হত। এক কথায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈপ্লবিক জীবন বিধান হিসেবেই শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হত।

বিদেশী ভাষা শিক্ষা

বিদেশী ভাষা শিক্ষা করাও পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু এটা সবার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রদের এ বিষয়ে পড়ানো হত। ইসলামের দ্রুত ও ব্যাপক প্রসারের ফলে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী

লোক রাসূলের (সাঃ) দরবারে আসতে থাকে। বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের সাথে যোগাযোগ এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য বিদেশী ভাষায় পারদর্শী লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

রাসূল (সাঃ) যায়েদ ইবনে সাবেতকে সুরিয়ানী ভাষা শেখার নির্দেশ দেন এবং তা তিনি শিখে নেন। এ ভাষায় রাসূল (সাঃ) এর কাছে কোন চিঠি-পত্র আসলে যায়েদ (রাঃ) তা আরবী তরজমা করে তাঁকে শুনাতেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এর জবাব লিখতেন। তিনি ফার্সী, হাবসী, হিব্রু এবং রোমান ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং বিদেশী ভাষার বিশেষজ্ঞ হিসেবে আখ্যায়িত হন। তিনি ছিলেন দরবারে নববীর সচিব।

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মদীনায় শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথে এর চার পাশেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মহানবী (সাঃ)র জীবদ্দশায় মদীনা ও এর সংলগ্ন এলাকায় নয়টি মসজিদ নির্মিত হয়। এ মসজিদগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেও ব্যবহৃত হত। এ সকল প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনা হযরত (সাঃ) নিজেই করতেন।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য লোক প্রেরণ

ইসলামী শিক্ষা ক্রমান্বয়ে মদীনার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। সুফফায় শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদের শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়।

তাঁরা বিভিন্ন গোত্রের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে কুরআন-হাদীস এবং ইসলামের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিতেন। আবার কখনো বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা প্রতিনিধির মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর কাছে শিক্ষক চেয়ে পাঠাতেন।

অষ্টম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সাঃ) আত্তাব ইবনে উসাইদ (রাঃ)কে এখানে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেন এবং মুআয (রাঃ)কেও তাঁর সহযোগী হিসেবে নিয়োজিত করেন। লোকদের কুরআন শেখানো এবং দ্বীনের জ্ঞান দান করার জন্য তিনি তাঁদেরকে মক্কায় রেখে যান।

নাজরান এলাকার প্রতিনিধি দল এসে মহানবীর (সাঃ)-এর কাছে কিছু সংখ্যক শিক্ষক চান। তিনি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) কে প্রতিনিধি দলের সাথে পাঠিয়ে দেন।

রাসূল (সাঃ) মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) ও আবু মূসা 'আশআরী (রাঃ) কে ইয়ামান পাঠান। সেখানকার অধিবাসীদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দেন। মুআয (রাঃ) ইয়ামান ও হাদরা মাউত এ দু'টি এলাকার শিক্ষা পরিচালক ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

রাসূল (সাঃ) বয়স্কদের লেখাপড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার সাথে সাথে শিশু শিক্ষার প্রতিও নজর দেন। এর ফলে বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। অবশ্য নিজ নিজ বাড়ি ছিল তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে তারা ঘরে বসেও লেখাপড়া করার সুযোগ পায়।

মহানবী (সাঃ) বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে এ শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্বে নিয়োগ করেছিলেন। একটি হাদীস থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। রাসূল (সাঃ) বলেছেন– "তোমাদের সন্তানগণ সাত বছরে পদার্পন করলেই তাদেরকে সালাত আদায় করার তাকিদ দাও। দশ বছরে পদার্পন করার পরও যদি তারা এ ব্যাপারে অলসতা করে তবে তাদেরকে শাস্তি দাও।" (আবু দাউদ)

প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠক হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) সমধিক খ্যাত ছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করেন।

নারী শিক্ষা

তৎকালীন আরব সমাজে নারীদের যেভাবে হেয় জ্ঞান করা হত, তাতে তাদের লেখাপড়া শেখানোর কথা ছিল কল্পনাতীত। মহানবী (সাঃ) ভাল করেই জানতেন একটি সফল, পুর্ণাংগ ও স্থায়ী সমাজ-বিপ্লব সাধন করতে হলে নারী পুরুষ উভয়কেই সমান ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তাই তিনি নারী শিক্ষার প্রতিও সমান গুরুত্ব আরোপ করলেন।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ -

এর নির্দেশ থেকে তাঁরাও বাদ পড়েনি। মহানবী (সাঃ) পুরুষদের যেভাবে

তা'লীম দিতেন মহিলাদেরও অনুরূপভাবে তা'লীম দিতেন। মহিলাদের তা'লীমের জন্যে তিনি একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সময়টিতে তিনি কেবল তাঁদেরকেই প্রশিক্ষণ দিতেন। ঈদের মাঠে দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন।

নারীদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি অভিভাবকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন–

'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান ও বোনকে লালন-পালন করে, তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষাদান করে, তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে, এমনকি তারা আর তার মুখাপেক্ষী থাকে না, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত অবধারিত করে দেন' (শারহুস্ সুন্নাহ)।

শুধু আযাদ মহিলারাই নয় ঘরের দাসী-বাঁদীরাও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকেনি। সে যুগের শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-র নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। যে আটজন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন আয়েশা (রাঃ) তাঁদের মধ্যে তৃতীয়া। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী এবং তাবেয়ী তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

'আসমাউর রিজাল' গ্রন্থে প্রায় এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লিখিত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে একশত পঞ্চাশ জন হচ্ছে মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।

রাসূলের (সাঃ) শিক্ষানীতি

রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষানীতি বিনির্মিত হয়েছিল মানব জাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির উদ্দেশ্যে। তাঁর শিক্ষানীতি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং বিশ্ব মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে রচিত হয়েছে। তা কোন বিশেষ যুগ বা কালের জন্য রচিত হয়নি বরং সর্বকালের সকল মানুষের মুক্তির দিশা তাতে রয়েছে। তাই তাঁর প্রদর্শিত শিক্ষানীতি সার্বজনীন ও চিরন্তন।

রাসূলের (সাঃ) শিক্ষা নীতির প্রথম কথাই হলো জ্ঞানের প্রকৃত উৎস

আল্লাহ তায়ালা। মহান আল্লাহই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস ও প্রকৃত মালিক। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ

অর্থঃ হে নবী বলো! আল্লাহই সমস্ত জ্ঞানের মালিক (সুরা মুলক ঃ ২৬)।

মানুষের জ্ঞান সীমিত। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করে মানুষকে যতোটুকু জ্ঞান দান করতে চান, সে কেবল ততোটুকু জানে।

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ

অর্থঃ তার জ্ঞাত বিষয়ের কোন কিছুই মানুষ নিজের আয়ত্বাধীন করতে পারে না, তবে তিনি যতটুকু চান। (সূরা বাকারা ঃ ২০৫)। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জ্ঞান লাভের সূত্র হলো অহী। যে পদ্ধতিতে নবীর কাছে জ্ঞান অবতীর্ণ করা হয়, তার পারিভাষিক নাম "অহী"।

রাসূল (সাঃ) আল্লাহর সর্বশেষ নবী। তাঁর উপর অবতীর্ণ অহী দু'ভাগে সংরক্ষিত আছে। এক-কুরআনের মাধ্যমে, দুই-হাদীস বা সুন্নতে রাসূলের (সাঃ) মাধ্যমে। তাই ইহজগত ও পরজগতের সর্বাংগীন কল্যাণ লাভ করতে হলে মানুষকে অবশ্যই জ্ঞানের এ মূল সূত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

রাসূল (সাঃ) যে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তার মূল শিক্ষক রাসূল (সাঃ) নিজেই। শিক্ষার সকল দিক ও বিভাগে তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। তাঁকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ
يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الاٰخِرَ ـ

অর্থঃ তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। ঐ ব্যক্তির জন্যে যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আশাবাদী। (সূরা আহযাব - ২১)

রাসূল (সাঃ) এর গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা যে মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তা হলো মানুষ আল্লাহর দাস এবং এ দাসই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। মানুষের মাঝে আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার চেতনা জাগ্রত করে তাঁকে আল্লাহর সত্যিকার গোলাম ও প্রতিনিধিরূপে গড়ে তোলাই এ শিক্ষানীতির মূল কথা।

রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষা মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের একই সাথে আত্মিক, মানসিক, নৈতিক, শারীরিক, জৈবিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেননি, সমন্বয় করেছেন। সবগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন।

রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

রাসূল (সাঃ) শিক্ষা দান পদ্ধতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেই একটি পরিষ্কার ধারনা দেয়া হয়েছে। শিক্ষা দান সংক্রান্ত আয়াত কুরআনের একাধিক স্থানে আছে- كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ – অর্থঃ যেমন আমি তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি। তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে, তোমাদেরকে আল কিতাব শিক্ষা দেয়, কর্মকৌশল শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা কিছু জানতে না তা তোমাদের জানিয়ে দেয়। (সুরা আল বাকারা- ১৫১) রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, প্রভাবশালী ও কার্যকর।

দুই'ভাগে বিভক্ত শিক্ষা পদ্ধতি। ক) মৌখিক পদ্ধতি ও খ) বাস্তব পদ্ধতি।

ক) রাসূল (সাঃ) এর মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি যখনই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে বলতেন। প্রতিটি শব্দের বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার উচ্চারণ করতেন। প্রয়োজনে প্রতিটি কথা তিন বার বলতেন।

তিনি বিরতি দিয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁর বক্তব্য শোনা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেউ যাতে বিরক্ত না হয় সেদিকে পূর্ণ লক্ষ্য রাখতেন। তিনি বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করতেন। শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলতেন। কারো সাধ্যের বাইরে তাকে কোন কাজ বা দায়িত্ব দিতেন না।

সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণ তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট। তিনি কখনো সাহাবীদেরকে নিরাশ করতেন না। তাঁদেরকে অকল্যাণের ব্যাপারে সতর্ক করতেন। বক্তব্য পেশ করার আগে তিনি শ্রোতাদের মনোযোগ পুরোপুরি আকৃষ্ট করে নিতেন। কখনো পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। কখনো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। আবার কখনো শিক্ষা দিতেন বক্তৃতার মাধ্যমে। এভাবে তিনি অত্যন্ত কৌশল, বিজ্ঞতা ও মর্মস্পর্শী পন্থায় মানুষের কাছে দ্বীনের শিক্ষা পেশ করতেন।

খ) শিক্ষাদানের বাস্তব পদ্ধতিই ছিল শিক্ষার আসল রূপ। তিনি যা কিছু মৌখিক শিক্ষা দিতেন, সেটা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেই দেখিয়ে দিতেন। আর এটাই ছিলো তাদের জন্য সবচাইতে বড় শিক্ষা।

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা

আল কুরআনের শিক্ষার আলোকে মহানবী (সাঃ) যে শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করেন, খুলাফা-ই-রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর হাতে সে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত বিকাশ লাভ করে। মহানবী (সাঃ) এর ইন্তিকালের পর খুলাফা-ই-রাশেদীনের আমলে নতুন নতুন দেশ ও এলাকা বিজিত হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পায়। কাজেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা অধিক অনুভূত হয়। তাই ইসলামী জ্ঞান, অনুশাসন ও কুরআনের নির্দেশ পালন ছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচী ব্যাপকভিত্তিক করা হয়। বিজিত অঞ্চলে নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হয় এবং শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে এ সকল মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর আমল

হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলামের প্রথম খলিফা। শিক্ষা-দীক্ষা ও চারিত্রিক মাহাত্ম্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। ইসলামী বিপ্লবের সূচনায় এবং অত্যাচার নির্যাতনের কঠিন দিনগুলোতে তিনি ছিলেন বিশ্বনবীর নিত্যসংগী। মহানবীর শিক্ষা, জীবনাদর্শ ও গুণাবলীর অনুসারী হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তাঁর খেলাফত কাল ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপৃত। তিনি কুরআন-হাদীসে অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি মাক্কার বিদ্বানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি কুরআনে হাফেজ ছিলেন। তিনিই প্রথম ইজতিহাদ বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করেন এবং ফিকাহ সম্পর্কে অনেক জটিল ও কঠিন প্রশ্নের জবাব এবং স্বপ্নের সর্বাপেক্ষা নির্ভুল ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। তিনি সালাতের ইমামতী করার পর শিক্ষামূলক আলোচনা করতেন এবং কুরআন শুদ্ধ করে পঠনের জন্য ক্বারী নিয়োগ করেন।

কুরআন গ্রন্থবদ্ধকরণ ঃ ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফেজ শাহাদাত বরণ করলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ) এর পরামর্শে যায়েদ বিন সাবিতের মাধ্যমে কুরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মহান কাজ ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা রক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা তাঁর আমলে আরও প্রসার লাভ করে। তিনি নতুন নতুন মসজিদ স্থাপন করেন এবং দেশের বিভিন্ন মসজিদে জ্ঞান বিস্তারের জন্যে অনেক আলেম ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। মহানবী (সাঃ) এর ওপর অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহ পাথর, কাপড়, কাঠ, চামড়া ও গাছের পাতায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) সর্বপ্রথম এ গুলোকে সুবিন্যস্ত করে 'মাসহাফ' নাম দিয়ে নিজের কাছে রাখেন।

হযরত ওমর (রাঃ) এর আমল

হযরত ওমর (রাঃ) (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ছিলেন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। মসজিদ-ভিত্তিক শিক্ষা তখন প্রসার লাভ করে। তিনি শিক্ষকগণকে বায়তুলমাল থেকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে সেনানায়ক নিযুক্ত করে শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

তখন মক্তবে কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে লিখন ও সাধারণ অংক শিক্ষা দেয়া হতো। অশ্ব-চালনা শেখানো বাধ্যতামূলক করা হয়। বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ এবং আরবী সাহিত্য পাঠের প্রতি তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দেন। শিক্ষকগণকে ভাষায় সুপন্ডিত হবার ব্যাপারে তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন। শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন বিধায় তিনি ভাষা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা নেন।

হাদীস শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি কয়েকজন সাহাবীকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান। ইসলামী আইন কানুন শেখানোর জন্য আবদুর রহমান ইবনে গানাম, আবু দারদা ইবনে জাবাল ও উবায়দা ইবনে সামেতকে সিরিয়ায় এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে মিশরে প্রেরণ করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) এর আমলে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠে। মক্কা-মদীনা ছাড়াও কুফা, বসরা, দামেস্ক, ফুস্তাত প্রভৃতি শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

হযরত ওমর (রাঃ) একজন প্রসিদ্ধ ফকিহ হিসেবে ফতোয়া দিতেন। ফিকাহ ও ইসলামী আইন কানুন শেখানোর জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে নামকরা শিক্ষক প্রেরণের বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

হযরত ওমর জুমআর খুৎবায় হজ্ব সম্পর্কিত বিধান আলোচনা করতেন। তিনি বেদুঈনদের শিক্ষার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। সুশাসক ওমর (রাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ছাড়া ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে না। তাই তিনি রাষ্ট্রের সর্বত্র শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন।

হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমল

হযরত ওসমান (রাঃ) ইসলামের তৃতীয় খলিফা। রাসূল (সাঃ) এর আমলে তিনি অন্যতম অহী লিখক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় আল কুরআনের নির্ভুল ও ধারাবাহিক সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কাজের জন্য তিনি জায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সংরক্ষিত 'মাসহাফ' নামক কপি ও অন্যান্য লিখিত অংশ সংগ্রহ করে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্ভুল সংস্করণ তৈরী করে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং পবিত্র কুরআনের বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) রাষ্ট্রের বিখ্যাত মসজিদগুলোতে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু রাখেন। কুরআন-হাদীস শিক্ষাদানের সাথে সাথে অংক, কাব্য চর্চা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভুগোল ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হত। তখন ধনী ব্যক্তিদের গৃহে কাব্য চর্চা ও কবিতা পাঠের আসর বসত। মদীনা মসজিদের সংস্কার ছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে শিক্ষা প্রসারে সহায়তা করেন।

হযরত আলী (রাঃ) এর আমল

খলিফা হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা। হযরত

আলী (রাঃ) অসাধারণ পান্ডিত্য, স্মৃতি শক্তি ও জ্ঞান গরিমার অধিকারী ছিলেন। তাই মহানবী (সাঃ) তাঁকে 'জ্ঞানের দরজা' বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) একজন অহী লেখকও ছিলেন। আরবী ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আলী' আরবী সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। তিনি আল কুরআনের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও সূরার ব্যাখ্যা দানে দক্ষ ছিলেন।

তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী ব্যাকরণ রচিত হয়। তাঁর আমলে কুফার জামে মসজিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। তিনি নিজেই এখানে শিক্ষার্থীদের কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিতেন। তাঁর আমলে সর্বপ্রথম হাদীস সংকলন লিপিবদ্ধ করণের কাজ শুরু হয়। তাঁর হাদীস গ্রন্থ সহীফা নামে পরিচিত। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ছিল ৫৮৬। তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। যুদ্ধ বিষয়ের উপর তাঁর বহু কবিতা রয়েছে। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দানের জন্য দুই হাজারেরও বেশী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করেন।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, খুলাফা-ই-রাশেদীনের যুগ ইসলামের সোনালী যুগ। এ যুগ হল মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার যুগ। এ আমলেই ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের সূত্রপাত হয় এবং আরবী ব্যাকরণ রচিত হয় ও পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থাও এ সময়ই প্রবর্তিত হয়।

উমাইয়া আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা

উমাইয়া শাসন আমল ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপৃত। উমাইয়া বংশের খলীফাগণ বিভিন্ন এলাকা বিজয় ও আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা বিস্তারের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। উমাইয়া বংশের কয়েকজন খলিফার মধ্যে খলিফা আব্দুল মালেক, প্রথম ওয়ালিদ ও ওমর বিন আবদুল আজিজ এর নাম শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা ক্ষেত্রে খলীফা আবদুল মালেকের অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি আরবী ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান করেন। তাঁর অন্যান্য অবদান হল আরবী ভাষায় হরকতের প্রবর্তন ও উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা। আরবী সহজতর পঠন ও লিখনের জন্য তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহযোগিতায় আরবী বর্ণমালার হরকত ও নোক্‌তা প্রবর্তন করেন এর ফলে আরবী ভাষা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। খলীফা আবদুল মালেক বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবকে দিয়ে কুরআন মজীদের তাফসীর লিখিয়েছিলেন। তিনি সাহিত্যিক ও কবিদের পুরস্কৃত করে উৎসাহ যোগাতেন।

হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ফারসী ভাষার বেশ কিছু গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন।

উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) শিক্ষার একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের বৃত্তি ও শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণে উদার নীতি গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের প্রতি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের নির্দেশ দেন। একজন শাসককে তিনি লিখেছিলেন "ছাত্রদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করে দাও যাতে তারা আর্থিক দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে শিক্ষা লাভে মনোযোগী হতে পারে।" হাদীস সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করা তাঁর শাসন আমলের একটি স্বর্ণোজ্জল কীর্তি। তাঁরই আগ্রহ ও আনুকূল্যে একজন বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসকের একখানি মূল্যবান গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।

উমাইয়া খলীফাদের পদাংক অনুসরণ করে তাঁদের আমীর-ওমরা এবং উজীরগণ জ্ঞানের চর্চা ও তার প্রসারের প্রতি সোৎসাহে এগিয়ে আসেন।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রচেষ্টা

উমাইয়া যুগে বহুসংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। নবী (সাঃ)-র প্রত্যেক সাহাবাই ছিলেন জ্ঞানের মশাল ও হিদায়াতের আলোক বর্তিকা। তাবেয়ীগণ বড় বড় সাহাবীদের থেকে জ্ঞানার্জন করে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন।

শিক্ষা কেন্দ্র

উমাইয়া যুগে সাম্রাজ্যের মসজিদগুলো ছিল শিক্ষা বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র। কুরআন-হাদীসকে ভিত্তি করে এ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ সময় মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা এবং মিশর প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে। এ সকল কেন্দ্রে তীর চালনা, অশ্ব চালনা, সাঁতার কাটা এবং আরবী পড়া ও লেখা শিক্ষা দেয়া হত। কুরআন শিক্ষার জন্য ক্বারী নিয়োগ করা হত এবং কারীগণই ছিলেন মূলত শিক্ষক।

খলীফা আবদুল মালেকের সময় গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়। আবদুল মালেক ও ওয়ালিদ বহু শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। উমাইয়া আমলে 'কিতাবুল আইন' নামে একটি আরবী অভিধান প্রণয়ন করা হয়। এ সময়েই ইতিহাস রচনা শুরু হয়। গ্রীক ও কপটিক ভাষায় লিখিত রসায়ন শাস্ত্র, চিকিৎসা, ফলিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এ যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয় এবং সারাদেশে ব্যাপকভাবে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে এমনকি সম্ভ্রান্ত বাড়িতেও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোকে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বলা যায়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কোন কোন স্থানে এ সকল বিদ্যালয়ে বেতন দিতে হত। ধনী ব্যক্তিরা অনেক মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য মসজিদ সংলগ্ন স্থানে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হত। উমাইয়া যুগের প্রথম দিকে সিরিয়ার 'বাদিয়া' নামক স্থানে বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। উমাইয়া খলীফা-আমির-উমরাহগণ গৃহ শিক্ষক-শিক্ষিকা রেখে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন। গৃহ শিক্ষকগণ হতেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং মাঝে-মধ্যে তাঁরা শিক্ষার্থীর ভাল-মন্দ নিয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করতেন।

পাঠ্যসূচী

উমাইয়া যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যসূচী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্‌র পাশাপাশি জ্যোতির্বিদ্যা, হস্তলিপি বিদ্যা ও বক্তৃতা অনুশীলনের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হত। ইতিহাস, কাব্য সাহিত্য, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ও পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল।

নারী শিক্ষা

উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করা হয়। হযরত মুস'আবের স্ত্রী আয়েমা বিনতে তালহা জ্যোতির্বিদ্যা ও আরব ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। হিশাম ইবনে আবদুল মালেক তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এক লাখ দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। হযরত মুস'আবের দ্বিতীয় স্ত্রী সাফিনা বিনতে হুসাইন কবিতা ও সাহিত্যের একজন উচ্চস্তরের গবেষক ছিলেন।

লিপি শিল্পের প্রতি আগ্রহ

উমাইয়া যুগেই জ্ঞান- বিজ্ঞানকে সর্বপ্রথম লিখিত আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এযুগেই শিক্ষা দানের পাশাপাশি পুস্তক প্রণয়ন ও গ্রন্থ রচনার সূচনা হয় এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ যুগের ছাত্ররা সর্ব প্রথম শিক্ষকদের দেয়া পাঠ লিপিবদ্ধ করতে এবং শিক্ষকের অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট পাঠ্য বই পড়তে শুরু করে।

শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন ও উন্নয়ন

পবিত্র কুরআনের বিখ্যাত সাতজন ক্বারীই উমাইয়া যুগের। এ যুগেই ফারাযদাক, জারীর ও আখতালের মত বিখ্যাত কবিরা বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। কালাম শাস্ত্রীয় বিভিন্ন ফিকাও এ যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময়ে নাহু-ছরফ শাস্ত্রের পত্তন হয়। আবুল আসাদ দুয়াইলী এর গোড়া পত্তন করেন। খলীল ইবনে আহমাদ বাযায়ী ইলমে উরুজ এবং সাবাওয়াবহ আরবী ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করেন। এ যুগে চিকিৎসা শাস্ত্র এতদূর উন্নতি লাভ করে যে চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা দানের ব্যবস্থাসহ সারা দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

আব্বাসীয় আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা

আব্বাসীয় খিলাফাত ৭৫০ হতে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। আব্বাসীয় খেলাফত কালে মোট ৩৭ জন খলিফা ছিলেন। মুসলিম শাসনামলের মধ্যে আব্বাসীয় যুগেই জ্ঞানানুশীলন এবং শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ সর্বাধিক হয়েছিল। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে "স্বর্ণ যুগ" বলে অভিহিত করেছেন। আব্বাসীয় খলিফাগণ বিজয়াভিযান পরিত্যাগ করে জ্ঞান আহরণের সুদূর প্রসারী অভিযান শুরু করেন।

আব্বাসীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময়ে একটি পূর্ণাংগ শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠে। তাঁরা ধ্বংস ও বিলুপ্ত প্রায় ইরাক, মিশর, পারস্য ও গ্রীসের প্রাচীন সাহিত্য, সভ্যতা ও কৃষ্টিকে শুধু রক্ষাই করেননি বরং তাকে জীবনী শক্তিদান করে নতুনভাবে জাগিয়ে তোলেন। আব্বাসীয় খলিফাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম পন্ডিতগণ চিকিৎসা বিদ্যা, ভুগোল, ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা চালিয়ে এবং বহু নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে তৎকালীন জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করেন।

পাঠক্রম

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম দিকের তিন জন খলিফা মনসুর, হারুন এবং মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফাগণের আমলে কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, হাদীস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ-তত্ব বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়গুলো উচ্চতর শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন ও হাদীসের সাথে পরিচিতি ও ইসলামের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনকে শিক্ষায় প্রাধান্য দেয়া হতো। আরবী বর্ণ পরিচয়, হস্তলিপি, কুরআনের বিশেষ অংশ মুখস্থ করণে এবং সাধারণ হিসাব ও কবিতা

শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়া হতো। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে বহু নতুন আবিষ্কার দ্বারা মুসলমান পন্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করেন।

শিক্ষার স্তর

আব্বাসীয় যুগে শিক্ষার দু'টি স্তর ছিলঃ প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে। এ সকল বিদ্যালয় মসজিদ ও ব্যক্তিগত গৃহে স্থাপিত হতো। এ ছাড়া অনেক মক্তবের মান ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মত। পিতা-মাতা সন্তানদের গৃহ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। ধনী ব্যক্তিরা শিক্ষক নিয়োগ করতেন। অভিজাত ঘরের মেয়েরা মুয়াদ্দিব (শিক্ষক) রেখে কুরআন শরীফ পাঠ ও ইসলামী জ্ঞান আহরণ করত। পঠন, লিখন, ব্যাকরণ, হাদীস, প্রাথমিক গণিত, ভাবমূলক কবিতা প্রভৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভূক্ত ছিল। এগুলো মুখস্থ করার উপর বেশী জোর দেয়া হতো।

উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা কুরআনের ব্যাখ্যা ও গবেষণামূলক সমালোচনা, রাসূল (সাঃ) এর হাদীসের বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা, আইন শাস্ত্র, ধর্মতত্ব, ছন্দ-সাহিত্য পাঠ করত। উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীগণ জ্যোতির্শাস্ত্র, দর্শন ও সঙ্গীত বিদ্যা অধ্যয়ন করত।

গৃহ শিক্ষক নিয়োগ

আব্বাসীয় আমলে গৃহেই শিশুদের শিক্ষা শুরু হতো। ছয় বছর বয়সে বালক-বালিকারা মক্তবে ভর্তি হতো। এ সময়ে গৃহ শিক্ষক নিয়োগের প্রথাও চালু ছিল। সমাজের ধনী লোকেরা গৃহ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের সু-শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। এ সময়ে “আমরাহ” নামক এক বিখ্যাত মহিলার কথা জানা যায়, যিনি তাঁর নিজ গৃহকে শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতেন।

সার্বজনীন শিক্ষা

আব্বাসীয় আমলে শিক্ষার দ্বার সবার জন্য সমভাবে উন্মুক্ত ছিল। ধনী-দরিদ্র সবাই শিক্ষা লাভে সমর্থ ছিল। শিক্ষার ব্যয় খুবই স্বল্প হওয়ার

কারণে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাও শিক্ষার আলো লাভে সমর্থ হত। এমন কি দাসগণও মক্তবে ভর্তি হতে পারত।

শিক্ষকদের মর্যাদা ও সম্মান

সেকালে শিক্ষকগণ যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যে সকল শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন তাঁদেরকে মুয়াল্লিম বলা হত। ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্য কোন কোন সময় তাঁদেরকে ফকীহ্ বলা হত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষকগণ 'মুয়াদ্দিব শিক্ষক' নামে অভিহিত ছিলেন। এ শ্রেণীর শিক্ষক সমাজে মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁরা খলীফাদের সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দিতেন। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা প্রাথমিক শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

তৃতীয় পর্যায়ে ছিলেন অধ্যাপকবৃন্দ। উচ্চ শিক্ষাদানে নিযুক্ত শিক্ষকগণকে অধ্যাপক বলা হত। অধ্যাপকবৃন্দ নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ন্যায় শাস্ত্র, গণিত, ছন্দ ও আইন শাস্ত্র শিক্ষাদানে নিয়োজিত অধ্যাপকগণকে জন সাধারণ খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

শিক্ষকদের বেতন-ভাতা

প্রথম দিকে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা খুবই কম ছিল। অনেকে নিয়মিত বেতন পেতেন না। সাধারণ শিক্ষক ও গৃহ শিক্ষকগণ যে বেতন পেতেন তা তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম হওয়ায় তাঁরা জীবিকা নির্বাহের খাতিরে রোজগারের জন্য অন্য কিছু করতেন। যে শিক্ষকের উপর শাহজাদাদের শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত হতো তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান। কালক্রমে শিক্ষকদের বেতন নিয়মিত হয়ে উঠে এবং সুযোগ সুবিধাও বৃদ্ধি পায়। তাঁদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পায়। শিক্ষক ও দরিদ্র ছাত্ররা মসজিদ, হাসপাতালের আয় এবং ধনী সম্প্রদায়ের চাঁদা হতে সাহায্য লাভ করতেন। তাঁদের কেউ কেউ সরকারী কোষাগার থেকেও ভাতা পেতেন।

শিক্ষকদের স্বাধীনতা

পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার পর পনের ষোল বছর বয়স্ক যুবকেরা সাধারণত উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে যেত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা অনুসরণের কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল না। নির্দিষ্ট কোন পাঠ্য তালিকা ছিল না। প্রত্যেক শিক্ষক বা অধ্যাপকের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্য তালিকা ছিল। শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার অধিকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার থাকলেও শিক্ষা পদ্ধতিও বিষয় নির্বাচনে শিক্ষকগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বাৎসরিক কোন ছুটি ছিল না। পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন শেষ না হলে সাধারণত ছুটি দেয়া হত না।

প্রবীন ও অভিজ্ঞ শিক্ষককদের পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ ছিল। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদেরকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। ছাত্ররা পাঠ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ দ্বারা শিক্ষককে সন্তুষ্ট করে তাঁদের নিকট থেকে সনদ লাভ করত।

নারী শিক্ষা

আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে নারীগণ সমাজে পুরুষের ন্যায় সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নারীদের প্রভূত প্রভাব ছিল। আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফার স্ত্রী উম্মে সালমা, মাহদীর মহিষী খায়জুরান, মাহদীর কন্যা উলাইয়া, হারুন-অর-রশীদের মহিষী জুবায়দা প্রমূখ নারীগণ রাজকার্যে যথেস্ট কর্তৃত্ব খাটাতেন। জুবায়দা উচ্চ গুণ সম্পন্না কবি ছিলেন। মামুনের মহিষী বুরান ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা। আব্বাসীয় আমলে ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব মায়েদের উপর ন্যস্ত ছিল।

কয়েকটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বায়তুল হিকমা ঃ আব্বাসীয় যুগে শিক্ষা কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। খলিফা আল-মামুন উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর রাজধানীতে ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'বায়তুল হিকমা' প্রতিষ্ঠা করেন।

বায়তুল হিকমায় উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হত। ইহা একাধারে শিক্ষালয়, লাইব্রেরী, অনুবাদ কেন্দ্র ও অনুসন্ধান কেন্দ্র রূপে ব্যবহৃত হত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য মৌলিক গবেষণা পরিচালনা ও মূল গ্রন্থ রচনা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কৃতিত্ব।

বায়তুল হিকমা মধ্য যুগ ও আধুনিক বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব দাবী করতে পারে। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্যারিস, অক্সফোর্ড ও ক্যমব্রিজের বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছে। বায়তুল হিকমার সাথে একটি বিরাট গ্রন্থাগারও ছিল। এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন আল-খারিযমী। তিনি একজন প্রখ্যাত অংক শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। আততাবারী, ইয়াকুবী ও মাসউদীর মত অনেক পন্ডিত ও মনীষীর বাগদাদের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাবেশ ঘটেছিলো। এঁদের জ্ঞান সাধনা ও গবেষণা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘাটিয়েছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান চর্চা এ কালে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

খলিফা মামুনের খিলাফাত কালে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। শিক্ষা সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চার জন্য তাঁর যুগকে ঐতিহাসিকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'স্বর্ণ যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি শিক্ষাকে গণমুখী করার জন্য সর্ব প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গোটা খিলাফত জুড়ে তিনি বহু বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি অনুবাদ কার্যের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিদেশী গ্রন্থের আরবী অনুবাদের জন্য তিনি তাঁর দরবারে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান।

নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

আব্বাসীয় খলিফাগণের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রের মধ্যে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেলজুক বংশীয় শাসকগণ এমনি একটি সালতানাত পারস্যে প্রতিষ্ঠা করে। সেলজুক বংশের খলিফা আল্প আরসালান খাজা হাসান নামক জনৈক পন্ডিতকে নিযামুল মূলক উপাধিতে ভূষিত করে উজিরে আযম নিযুক্ত করেন। নিযামুল মূলক শিক্ষা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেও একজন বিজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। তিনি ১০৬৫-১০৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাগদাদে বিখ্যাত নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নিযামুল মূলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ "বিশ্ববিদ্যালয়ই" ছিল ইসলামের প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ "বিশ্ববিদ্যালয়" পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়েছিল। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে নিযামুল মুলকই সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নিযামুল মুলক একটি ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সরকারী আনুকূল্যে অনেক ছোট বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অভিজ্ঞ, উচ্চ শিক্ষিত ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরকে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীও (রঃ) দীর্ঘ চার বছর নিযামিয়ায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সরকারী সাহায্য ছাড়াও নিযামুল মুলক ব্যক্তিগত সম্পত্তির এক দশমাংশ শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় করেছিলেন।

নিযামিয়াতে শাফেয়ী ও আশ্‌আরী মাযহাব সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হত। তাছাড়া কুরআন , হাদীস, কবিতা, ভাষাতত্ত্ব এ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কেও এখানে শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা ছিল। নিযামিয়ার অনুকরণে খোরাসান, সিরিয়া ও ইরাকে বহু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিযামিয়ায় মুসলিম জাহান ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে বহু শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে জ্ঞানার্জনে ব্রতী হতেন। নিযামিয়া ছিল তদানিন্তন আব্বাসীয় খলিফার স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে খলিফার মতামত প্রাধান্য পেত।

এখানে অধ্যাপকগণকে উচ্চহারে বেতন দেয়া হত এবং সমাজে তাঁদের মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাজিয়া কলেজ

সেলজুকদের অন্যতম উযীর তাজ-উ-দ্দৌলা শিক্ষার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তিনি বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামানুসারে তাজিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তাঁর শিক্ষানুরাগের প্রমাণ রেখেছেন। তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু সংস্কার সাধন করেন। তাঁর আমলে সকল উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাদীসই ছিল পাঠ্য তালিকার ভিত্তি। তিনি তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় মুখস্থ করার উপর বেশী জোর দিতেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জনগনকে উৎসাহ প্রদান করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে আর্থিক সমস্যায় না পড়ে সে জন্য তিনি জনসাধারণকে জমি ও সম্পত্তি দান করার আহ্বান জানান এবং তাতে বিপুল সাড়া পান। তাঁর সময়ে মসজিদগুলোতে সাহায্য তহবিলের ব্যবস্থা করা হয় এবং পাঁচ শতাধিক ছাত্র মসজিদ ফান্ড থেকে দৈনিক বরাদ্দকৃত খাদ্য ও রেশন পেতে থাকে।

কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়

মুসলিম শাসন আমলে কর্ডোভা স্পেনের রাজধানী ছিল। তদানিন্তন স্পেনে উমাইয়া বংশের খলিফা দ্বিতীয় হাকাম উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী কর্ডোভায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আব্বাসীয় খিলাফত ও স্পেন ছাড়াও আফ্রিকার ছাত্রদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন ও ফলিত বিজ্ঞান পড়ানো হত। বিভিন্ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অনেক পন্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল কর্ডোভায়। তাই কর্ডোভা 'পন্ডিত প্রসূ' নামে আখ্যায়িত হতো। কর্ডোভা বিশ্ব-বিদ্যালয় মিশরের আল-আজহার এবং বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় অপেক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়

খলিফা আল- মুইজ ছিলেন ফাতেমী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা । তাঁর

আমলে সেনাপতি জওহর মিশরের রাজধানী ফুসতাত অধিকার করেন। ৯৭২ সালে সেনাপতি আল-আজহারে একটি মসজিদ নির্মান করেন। পরবর্তী খলিফা আবদুল আজিজ উক্ত মসজিদে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এই পাঠাগারই ক্রমে ক্রমে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপলাভ করে। আল-আজহারের অধ্যক্ষের উপাধি ছিল নাজির। একাডেমিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের দায়িত্ব নাজিরের উপর ন্যস্ত ছিল। প্রথম দিকে এখানে মালেকী মাযহাবের শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া হলেও পরবর্তী সময়ে হানাফী মাযহাব থেকে নাজির নিয়োগ করা হত।

আল-আজহারের পাঠ্যসূচীতে শিক্ষাদানের তৎকালীন প্রচলিত পদ্ধতি চালু ছিল । এখানে কুরআন, হাদীস, ফিকাহশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব এবং বালাগাত শাস্ত্রের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেয়া হত। আল- আজহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। অথচ ১৯৬১ সাল থেকে আল-আজহারে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়।

মুস্তান সিরিয়া

খলিফা আল মুস্তানসির ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে চারটি মাযহাবের বিদ্যালয় হিসেবে "মুস্তানসিরিয়া' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সুন্নীদের চারটি মাযহাবের জন্য চারটি পৃথক বিভাগের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেকটি বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন অধ্যাপক। প্রত্যেক অধ্যাপকের অধীনে পঁচাত্তর জন ছাত্র থাকত। তিনি তাদের বিনা বেতনে শিক্ষা দিতেন। অধ্যাপকগন সরকারী তহবিল থেকে মাসিক ভাতা পেতেন। ছাত্রদের প্রত্যেককেই একটি করে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হত। এই কলেজের ছাত্রগণ প্রত্যেকে রেশনে নিয়মিত রুটি ও গোশত পেত।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

অষ্টম শতাব্দীর ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে উমাইয়া খলিফা ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসনামলে মুসলিম সেনাপতি ইমামউদ্দীন মুহাম্মদ বিন কাশেম সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত করে ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতান এলাকায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। এ বিজয় ছিল পরবর্তী মুসলিম বিজেতাদের জন্য দিক নির্দেশনা, যার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। ইসলামী আদর্শ ও চেতনার অধিকারী মুসলিম জাতি পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই ইসলামের প্রচারও প্রসারে ভূমিকা পালন করেছেন এবং শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার ঘটিয়েছেন। ভারতীয় উপ মহাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দী মুসলমানদের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির চরম যুগ। এই গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে বিজয়ী মুসলমানগণ প্রথমে উত্তর ভারতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, পরে তাঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্যত্র। ফলে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ছত্র-ছায়ায় সযত্নে লালিত ও বিকশিত হয়েছে ইসলামের ঐতিহ্যময় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা।

ইসলামী আদর্শের প্রচারে মুবাল্লীগ ও মুসলিম বণিকদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা এসেছেন আরব, ইরান, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া থেকে এবং ছড়িয়ে পড়েছেন এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তাঁরা এদেশে গড়ে তুলেছেন হাজারো শিক্ষা কেন্দ্র।

মুসলমানদের শাসনকাল

মুসলিম সুলতানদের শাসনকালে ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে কাশেমের সিন্ধু ও মুলতান এলাকা বিজয়ের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে যে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় তা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকে এবং মুসলিম সুলতানগণ ক্রমে গোটা ভারতবর্ষ অধিকার করেন এবং ইসলামী

সালতানাতের সীমানা বিস্তৃত করেন। বিজয় অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদের (১০০১-১০৩০) অবদান অনস্বীকার্য। গজনীকে তিনি তদানিন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি শিক্ষা ও শিক্ষিতদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দরবার ছিল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের মহামিলন কেন্দ্র এবং প্রায় চার শ'রও অধিক কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

সুলতান শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৪-১২০৬) ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য আজমীর ও অন্য অনেক শহরে বড় মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি দিল্লীতে ১১৯২-৯৩ সনে বিখ্যাত 'কুওয়াতুল-ইসলাম' নামক মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি কয়েকজন যোগ্য ক্রীতদাসকে সু-শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত ক্রীতদাসগণই পরবর্তীকালে দিল্লীর যোগ্য সুলতানরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। শিহাবুদ্দীন ঘোরী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক এস. এম. জাফর বলেন, ভারতীয় রাজা-বাদশাদের মধ্যে মুহাম্মদ ঘোরীই ছিলেন সর্ব প্রথম শাসক যিনি শিক্ষা বিস্তারকে নিজ দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তাই ভারতে ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ স্থাপনে মুহাম্মদ ঘোরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কুতুবুদ্দীন আইবেক (১২০৬-১২১০) ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তিনি সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর জামাতা ও সেনাপতি ছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবুদ্দীন আইবেক স্বাধীন সুলতানরূপে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। কুতুবুদ্দীন ছিলেন জ্ঞানী, গুণী ও সুশিক্ষিত। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর যথেষ্ঠ ব্যুৎপত্তি ছিল। দানশীলতার জন্য তিনি ইতিহাসে দ্বিতীয় হাতেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

কুতুবুদ্দীন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি মসজিদসমূহে ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "কুওয়াতুল ইসলাম"

নামক মসজিদটির নির্মান কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর নির্মিত আজমীরের মসজিদকে 'আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া' বলা হত। মসজিদ সংলগ্ন মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকা ছিল সে যুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মক্তব ছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সূরা, কিরাআত, অক্ষরজ্ঞান ও লিখন-পঠন শিক্ষা দেয়া হত। আর মাদ্রাসা ছিল উচ্চস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্, উসূল, সাহিত্য ও দর্শন শেখানো হত। রাজ প্রাসাদেও স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিল্জী বাংলা বিজয় করেন এবং এদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তিনি একজন দ্বীনদার শাসক ছিলেন। তিনি নিজেই কয়েকটি মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তার পদাংক অনুসরণ করে আঞ্চলিক শাসকগণও বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

সুলতান ইলতুতমিশ (১২১১-১২৩৬) বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষানুরাগী ও বিচক্ষন সুলতান ছিলেন। তিনি শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সালতানাতে ইসলামী শিক্ষাদানের জন্য বহু মক্তব, মাদ্রাসা, সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিলো। ফলে রাজধানী দিল্লী ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মস্ত বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

সুলতান ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়াও তাঁর পিতার মত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মুইজী মাদ্রাসা খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে। উচ্চ শিক্ষালাভের এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল।

সুলতান ইলতুতমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬) মুসলিম ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি পূর্ণ ইসলামী জীবন যাপন করতেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। তাঁর দরবার সাহিত্যিক ও বিভিন্নমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মিলন কেন্দ্রে পরিনত হয়েছিল।

সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৬) তাঁর পূর্বসুরীদের মত

বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর দরবার সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সুলতান বলবনের মত তাঁর সুযোগ্য পুত্রগণও বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন।

খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দীন খিলজী (১২০৯-১২৯৬) বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী ও শিক্ষানুরাগী সুলতান ছিলেন। তাঁর দরবারে যেসব যশস্বী মনীষীর সমাবেশ ঘটেছিলো তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমীর খসরু, খাজা হাসান, আমীর আরসামা, তাজউদ্দীন ইরানী ও কাজি মুগীস। আমীর খসরু রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ে দিল্লী শিক্ষিত ও বিদ্বানদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। কলা ও বিজ্ঞানে ডিগ্রী প্রাপ্ত পঁয়তাল্লিশ জনের মত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে কাজ করতেন। তাঁর আমলে দিল্লী মুসলিম শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি বহু প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা ও পান্থশালা নির্মাণ করেন।

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াস উদ্দীন তুঘলক বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তাঁর সময়েই বিদ্বান ব্যক্তিদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিলো।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩১৫-১৩৫১) ছিলেন শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। কলা ও বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তিনি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষার জন্য তাঁর অবদান ছিল অতুলনীয়। তাঁর বদান্যতায় দিল্লীতে বহু মক্তব, মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপিত হয়। পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তাঁর দরবারে নয় বছর কাজী হিসেবে কাজ করেন।

তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দক্ষতা ছিল। কুরআন, হাদীস, তর্কশাস্ত্র, গ্রীক ও মুসলিম দর্শন, গণিত, শরীর বিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮) শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তার কোন তুলনা নেই। তিনি নিজে 'ফতুহাতে

ফিরোজশাহী' নামে তাঁর শাসন আমলের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ছিলেন সুপন্ডিত। শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি অকৃপণ হাতে দান করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে তিনি বিশিষ্ট শিক্ষকদের তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি তাঁর রাজত্বে প্রায় ত্রিশটির মতো মহাবিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে তাতে বেতনভোগী দক্ষ অধ্যাপক নিয়োগ করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফিরোজ শাহী মাদ্রাসা। এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল মসজিদ ও জলাধার। জালাল উদ্দীন রুমী ছিলেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল লোদী সংস্কৃতিবান ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর শাসনাধীন এলাকায় কয়েকটি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সুলতান সেকান্দর লোদী নিজেই একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার ওপর জোর দিতেন। মুসলমানদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাঁর সময়ে সামরিক প্রশিক্ষণ ও সাধারণ শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একীভূত করা হয়েছিল।

শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহর যুগকে বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি মসজিদে মক্তব চালু হয়। গৌড়, পান্ডুয়া, মহীসর, সোনারগাঁও, নামর, মান্দারল, বাঘা, রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সুলতান মালদহে একটি বিরাট মাদ্রাসা স্থাপন করেন। প্রখ্যাত আলেম নূর কুতুবুল আলমের মাদ্রাসা, মসজিদ ও হাসপাতাল স্থাপনে সুলতান বিরাট অংকের অর্থ দান করেন। তাছাড়া হিন্দুদের জন্য টোল চালু ও তার পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন।

ভারতবর্ষে মোঘল শাসন আমল শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করে। মোঘল পরিবারের প্রতিটি সদস্যই প্রতিভাশালী, শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মোঘল দরবার জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। দরবারগুলো শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে দেখা দেয় এবং এর সুনাম সমগ্র বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

মোঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দীন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩১) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রতিভাবান কবি এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহু মক্তব-মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। নির্মাণ ও গঠনমুলক কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি 'শুহরত-ই-আম' নামে একটি গণপূর্ত বিভাগ সৃষ্টি করেন। তাঁর শাসন আমলে দিল্লী শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এর উন্নয়নে বাবর যে অবদান রেখে গেছেন তা অতুলনীয়।

সম্রাট নাসিরউদ্দীন হুমায়ুন (১৫৩০-৪০,১৪৫৫-৫৬) ছিলেন তুর্কী, ফারসী এবং আরবী ভাষায় সুপন্ডিত। তাছাড়া তিনি একজন পুস্তক সংগ্রাহক এবং পাঠ্যানুরাগী পন্ডিত ছিলেন। সম্রাট হুমায়ুন নারী শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন। শাহজাদীদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি ইরান ও তুরষ্ক থেকে শিক্ষয়িত্রী আনিয়েছিলেন যাঁদের 'আতুন' বলা হত।

শুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শের শাহ (১৫৪০-১৫৪৫) ছিলেন অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী। ফলে অল্প বয়সে তিনি শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাতিয়ালার শেরশাহী মাদ্রাসা খুবই বিখ্যাত ছিল। তাছাড়া মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় আরবী ও ফারসী ভাষা ছাড়াও ইসলামী বিষয় শিক্ষা দান করা হত। তিনি মসজিদ ও মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সময়ে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা, টোল, পাঠশালা দেশের আনাচে-কানাচে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৫) একজন পন্ডিত ছিলেন। তিনি ফার্সী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, নীতিকথা, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি কিছুসংখ্যক বিলুপ্তপ্রায় 'মক্তব ও মাদ্রাসার' সংস্কার সাধন করে পুনরুজ্জীবিত করেন যেগুলো তিন দশক ধরে পশু-পাখির বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি এসব প্রতিষ্ঠানকে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সমাবেশ ঘটিয়ে চালু করেন।

সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮) নিজে বিদ্বান ছিলেন। ফলে শিক্ষারও শিক্ষিতের তিনি যথার্থ মর্যাদা দিতেন। তিনি 'দারুল বাকা' নামক মাদ্রাসা

পুনর্নির্মাণ করেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী জামে মসজিদের উত্তর পাশে তিনি প্রসিদ্ধ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) ছিলেন অতীব মেধাবী। তিনি সমস্ত কুরআন শরীফ মুখস্থ বলতে পারতেন। তাছাড়াও তিনি ইসলামী শরীয়ত ও ফিকাহ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট হয়েও তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। কুরআনের আদেশ-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাঁর পূত-পবিত্র চরিত্র ও পরহেজগারীর জন্য তাকে 'জিন্দা পীর' বলা হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য আওরঙ্গজেব সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

তিনি তাঁর শাসন আমলে অসংখ্য মক্তব, মসজিদ, মাদ্রাসা, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। আওরঙ্গজেবের সময়কালের শিক্ষা পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষা দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ইসলামী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরই সময়ে পাঞ্জাবের শিয়ালকোট ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সম্রাট ইসলামী আইন ও ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর আগ্রহী ছিলেন। তাঁর তত্বাবধানে রচিত 'ফতোয়ায়ে আলমগিরী' মুসলিম আইনের ক্ষেত্রে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও রূপ

কয়েক শতাব্দীকাল জুড়ে পরিব্যাপ্ত মুঘল শাসন আমলে এ দেশে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। এ সময়ে মুসলমানরা এদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মুসলিম শাসক, আলেম-উলামা, আমীর-উমরা ও বিদ্যোৎসাহী দ্বীনদার লোকদের প্রচেষ্টায় গোটা ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে মক্তব-মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

ভারতের মুসলিম শাসকগণ শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। এ জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ বরাদ্দ করেন। শাসকদের দরবারে জ্ঞানী-গুণী ও পন্ডিতগণ বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান পেতেন। শিক্ষা প্রসারের জন্য শাসকগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রভূত পরিমাণে লাখেরাজ ভূসম্পদ দান করতেন। বাংলার মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। মুসলিম জমিদার, লাখেরাজদার, আয়মাদার

প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রধানগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকার মক্তব ও মাদ্রাসা কায়েম করে এ সবের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রভূত ধন সম্পদ ও জমি-জমা দান করেন।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রথম স্বতন্ত্র গৃহ কখন এবং কোথায় নির্মিত হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। 'তারিখে ফেরেস্তা' হতে জানা যায় যে সর্বপ্রথম মাদ্রাসা ভবন নির্মিত হয় মুলতানে। এ সময়ে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, রামপুর, মাদ্রাজ, ঢাকা ছাড়াও পাক-ভারতের অন্যান্য বড় বড় শহরে এ ধরনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ছাড়াও মসজিদ, আমীর-উমরা বা ধনী ব্যক্তিদের বসতবাড়ির অংশ বিশেষ এবং এমনকি ছায়াবনে বৃক্ষতলও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য থাকত চাটাইয়ের বিছানা, কিতাব রাখার জন্য কাঠের উঁচু পিঁড়ি এবং শিক্ষকদের বসার জন্য গদীর আসন।

শিক্ষা কাঠামো

মুসলিম শাসকগণ শিক্ষার উন্নয়ন, প্রসার ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করলেও মুসলিম শাসন আমলে এ দেশে শিক্ষা বিভাগ নামে স্বতন্ত্র কোন বিভাগ ছিল না। উলামায়ে কিরাম এবং শিক্ষকগণই সে দায়িত্ব পালন করতেন। পাঠ্য বিষয় এবং পাঠ্যসূচী প্রণয়নেও সরকারের কোন হাত ছিল না। তাই সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুনির্দিষ্ট কোন শিক্ষানীতি বা কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হত না। সে সময়ে সাধারণত দু' স্তরের শিক্ষা চালু ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর ঃ মক্তব এ স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এতে কুরআন পাঠ ও ফারসী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হত। গ্রামের আনাচে-কানাচে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মক্তব' প্রতিষ্ঠিত ছিল। মক্তবে গ্রামের সাধারণ কৃষক ও অন্যান্য পেশাজীবী লোকদের সন্তানগণ পড়াশুনা করত। মক্তবে ভর্তির ব্যাপারে তেমন কোন নিয়ম কানুন ছিল না। যে কোন সময় যে কোন বয়সে ভর্তির সুযোগ ছিল। মক্তবে সুর্যোদয়ের সাথে সাথে শিক্ষাদান কাজ আরম্ভ হয়ে বেলা প্রায় ১০টা ১১টা পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলত।

পাঠ্য তালিকা ঃ মক্তবে সর্বপ্রথম পাঠ শুরু হত 'কায়দায়ে বাগদাদী' পড়ানোর মাধ্যমে। অতপর কুরআন শরীফের ৩০তম পারা (আম-পারা) পড়ানো হত। আমপারা শেষ হবার পর গোটা কুরআন শরীফ পড়ানো হত। কুরআন মাজীদ খতম করার পর চরিত্র গঠন মূলক ফার্সী বই পড়ানো হত এবং অযু ও সালাত আদায় করার নিয়ম কানুন শিক্ষা দেয়া হত।

পাঠদান পদ্ধতি ঃ শিক্ষক ছাত্র সকলেই বিস্‌মিল্লাহ্ বলে পাঠ আরম্ভ করতেন এবং ছাত্ররা বিছানায় ওস্তাদের সম্মুখে আদবের সাথে হাঁটু পেতে বসত। তারা প্রথমে বিগত পাঠ শুনাতো। তা শুনাতে পারলেই নতুন সবক ও পাঠ দেয়া হত। সাধারণত সাত আট বছর বয়সেই তারা কুরআন পাঠ শিখে ফেলত।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা মাদ্রাসা ঃ সেকালে আধুনিককালের মত কোন বোর্ডের অধীনে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হত না। সারাদশের আলেম-ওলামাই শিক্ষানীতি, পাঠ্য-বিষয়, পাঠ্য-তালিকা ইত্যাদি প্রণয়ন করতেন। উচ্চশিক্ষার চাবি-কাঠি ছিল আলেমদের হাতে। ফারসী মাদ্রাসা ও আরবী মাদ্রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন দেশের সুলতান, আমীর-উমরা এবং নবাবগণ। তাঁরা এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ-সম্পদ বরাদ্দ ও দান করতেন।এ সব মাদ্রাসার নামে বড় বড় জায়গীর ও ওয়াকফ সম্পত্তি দান করা হত। তাছাড়াও জনসাধারণ এসব প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে দান করতেন।

ফারসী মাদ্রাসা ঃ এতে ফারসী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা প্রদান করা হত। সুলতান মাহমুদ গজনবীর শাসন আমল থেকে ইংরেজ শাসন আমল পর্যন্ত ফারসী ছিল পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা। সেজন্য এ দেশে ব্যাপক হারে ফারসী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফারসী ভাষা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় ও শিক্ষা দেয়া হত। এরমধ্যে ইলমে ফিকাহ, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি বিষয়। এ সকল মাদ্রাসায় শ্রেণী বিন্যাসের ব্যবস্থা ছিলনা। শিক্ষার কাল বছর দ্বারা গণনা না করে পাঠ্য পুস্তক দ্বারা করা হত। ফারসী মাদ্রাসার শিক্ষকদের মিয়াঁজি, আখন্দজী এবং মোল্লা বলা হত।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

ফারসী মাদ্রাসাগুলোতে সাধারনত বুধবারে নতুন কিতাবের সবক দেয়া হত। কুরআন মজীদ খতম হবার পরপরই ফারসী ভাষা শিক্ষাদান শূরু হত। মুখস্থ করার প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হত এবং প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথকভাবে পাঠদান করা হত।

উচ্চশিক্ষার স্তর

আরবী মাদ্রাসা ঃ মূলত আরবী মাদ্রাসাগুলো ছিল উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র। এ মাদ্রাসাগুলোতে ভর্তির সময় ছিল শাওয়াল মাস। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে একমাস পরেও ভর্তি করানো যেত। বয়সের ভিত্তিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করা হতনা। কেউ কেউ অধিক বয়সেও এ সকল মাদ্রাসায় ভর্তি হতেন। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শিক্ষাদান কাজ আরম্ভ হয়ে আসর পর্যন্ত চলত। মাঝখানে যোহরের সালাত ও খাবার বিরতি হত। অনেক মাদ্রাসায় খানা পাকানোর ব্যবস্থা ছিলনা। এলাকাবাসীরাই ছাত্রদের খাবারের পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। ছাত্রদের মসজিদের হুজরায় অথবা লজিং এ থাকার ব্যবস্থা ছিল। ১৪/১৫ বছরেই তারা শিক্ষাকাল সমাপন করত। শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হত। আরবী মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপনকারীকে 'আলেম' খেতাব দেয়া হত। আরবী মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে মৌলভী বা মোল্লা বলা হত।

পাঠ্য বিষয় ঃ মুসলিম শাসন আমলে এ দেশে আরবী মাদ্রাসাগুলোই যে সর্বোচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল তা আমরা উল্লেখ করেছি। এ সকল মাদ্রাসায় কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে আরবী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হত। এসব মাদ্রাসায় পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা হত। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানদানের উপযুক্ত গ্রন্থাবলী পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হত। পাঠ্যপুস্তক সমূহ ও বিষয়ের ভিত্তিতে এগুলোকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। ১) আল উলুমুল নাকলীয়া, যাকে উলুমে শারীয়া আরাবীয়া বলা হত। ২) আল উলুমুল আকলীয়া, যাকে উলুমে নাজরীয়া অর্থাৎ তাত্ত্বিক জ্ঞান বা কলা বিভাগ বলা হত।

আল উলুমুল নাকলীয়া বা উলুমে শারীয়া বিভাগে বিষয় থাকতো ইলমুল মিরাস, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ইলমে তাওহীদ, আল আদাবুল আরাবী,

ইলমে বায়ান, ইলমে তাসাউফ ও মানতিক। এ বিষয়গুলোর সাথে সাথে রাসূল (সাঃ) এবং অন্যসব নবীদের জীবনেতিহাস পড়ানো হত। ফারসী ভাষা শিক্ষাদানেরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকত।

আল উলুমে নাজরিয়া– এ বিভাগে বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি ও চিকিৎসা সহ বিজ্ঞানের সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। বিষয়গুলো হচ্ছে, মানতিক (লজিক), হিকমাত, ইলমুন হাইয়াত ওয়াননুজূম, হিসাব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফিজিকস্, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং এনাটমী ও মিউজিক।

এ সকল মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাঝ থেকেই বের হয়ে আসতো গবেষক, চিন্তাবিদ, বিচারক, প্রশাসক, টেকনিসিয়ান, চিকিৎসক এবং বিভিন্ন পেশার লোক। এ শিক্ষাই দেশের সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দাবী পূরণ করত।

আরবী মাদ্রাসায় শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অতি চমৎকার। শিক্ষক যে বিষয়ে ক্লাসে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন, সে বিষয়টিই পুনরায় ক্লাসের একজন ভালো ছাত্র পড়াত। এ পদ্ধতি সারা বছর অনুসরণ করা হত এবং এভাবেই কোর্স শেষ করা হত। এ পদ্ধতিতে ছাত্রদের পক্ষে যেমন কোন বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা অর্জন করা সম্ভব হতো তেমনি ভবিষ্যতে একজন যোগ্য শিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠতেও সাহায্য করত। এছাড়াও উপরের ক্লাসের ভাল ছাত্রদের নিচের ক্লাসে শিক্ষাদানের সুযোগ দেয়া হত। এ ভাবে তাদের শিক্ষকতার পেশাগত প্রশিক্ষণও হয়ে যেত। ক্লাসেই ছাত্ররা তাদের দৈনন্দিন পাঠ প্রস্তুত করে নিত এবং ক্লাস শেষে বিরতির মাঝে সবাই মিলে গ্রুপ-ভিত্তিক আলোচনা করত।

সে সময়ে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে প্রতিটি মুসলমান ছিল সক্রিয়। শিক্ষার বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের মানসিকতা কারো ছিল না। বরং নিজ উদ্যোগে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিতদের শিক্ষাদান করতেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে। পড়াশোনা শেষ করে ছাত্ররা যাতে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে সে জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা হত এবং শিক্ষকতা করার জন্য সনদ (অনুমতি পত্র) প্রদান করা হত। কোন বিখ্যাত ও সুযোগ্য ওস্তাদ থেকে সনদ ও অনুমতি না পেলে কেউ শিক্ষকতা করতে পারতেন না।

এভাবে পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমানগণ এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন যা শিক্ষার ইতিহাসে অনন্য এবং গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

অবৈতনিক শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষার প্রথম পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বপর্যায়ে শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। 'শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা বিতরণ 'ই ছিল প্রত্যেক মুসলমানের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। জনগণ সাওয়াবের আশায় বিভিন্ন প্রকার জমি ও সম্পদ ওয়াক্‌ফ করতেন। এ ওয়াকফকৃত জমি ও সম্পদের আয় দিয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হত। এমনকি ছাত্র শিক্ষকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হত।

সমন্বিত শিক্ষা

সে সময়ে শিক্ষা ছিল সুসমন্বিত। শিক্ষার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী পন্ডিত তৈরী হত যাঁরা সমাজ জীবনের সকল পর্যায়ে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম শীর্ষস্থান দখল করেছিল। ইসলামের ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষার সকল কিছু পরিচালিত হত। প্রতিটি মাদ্রাসাই সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এ সকল মাদ্রাসার শিক্ষিত আলেমগণই দেশ ও জনগণকে ধর্মীয় নেতৃত্ব দান করতেন এবং সমাজ কর্মী, চিকিৎসক, বিচারক, উকিল, সাহিত্যিক, প্রকৌশলী, স্থপত্যবিদ কারিগর, প্রশাসক হিসেবে দক্ষতার সাথে ভূমিকা পালন করতেন। দেশ ও জাতি এ সকল ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে এরূপ মাদ্রাসা শিক্ষার ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন।

স্বাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা

সকল পর্যায়ের শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারীভাবে পরিচালিত হত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তিনি শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকা পালন করতেন। কারিকুলাম, কোর্স নির্ধারণ ও পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা প্রধান তাঁর অন্যান্য সহযোগী শিক্ষকদের সহযোগিতা নিতেন। মুসলিম শাসন আমলে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন

ছিল। ক্ষমতাসীন শাসকদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হত না। ছাত্রগণও তাঁদের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তাঁরা তাঁদের মেধা ও রুচী অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে পারতেন। তাঁদের জন্য সাহিত্য, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গণিতের উপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অবারিত সুযোগ ছিল।

শিক্ষার প্রচার ও প্রসার

মুসলিম শাসন আমলে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও তার প্রসারের জন্য তৎকালীন শাসকদের পক্ষ থেকে এবং সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হত। সে সময়ে মসজিদকে শুধুমাত্র সালাত ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের ঘর হিসেবেই দেখা হতো না বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হতো। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত দেয়া হত। সারা দেশের প্রতিটি মসজিদে অশিক্ষিত বয়স্ক লোকদের কুরআন এবং ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ শিক্ষা দেয়া হত। দেশ ও সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণেও গণশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ফলে মুসলমানগণ ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা দান ও শিক্ষার বিস্তারে উৎসাহিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মসজিদ আজ তার অতীত মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে এবং যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

নারী শিক্ষা

মুসলিম শাসন আমলে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের গৌরবময় ভূমিকা ছিল। নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর বা পর্যায় পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের একসাথে শিক্ষাদানের প্রচলন ছিল। মেয়েরা ব্যাপকহারে মক্তবে কুরআন শরীফ শিক্ষা করত। উচ্চ শিক্ষার জন্য বয়স্ক মেয়েদের বাড়ীর অন্দর মহলে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হত। শাসক পরিবারের মহিলাদের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত প্রাসাদের অভ্যন্তরে। ধনী ও সম্পদশালী পরিবারের মহিলাদের জন্যও গৃহাভ্যন্তরেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। দিল্লীর এক সময়ের সম্রাজ্ঞী ছিলেন সুলতানা রাজিয়া। তিনি কয়েকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইবনে বতুতা ভারত ভ্রমণকালে তিনটি মহিলা মাদ্রাসা দেখেছেন বলে তার ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন।

ইংরেজ আমলের পাক-ভারত ও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

মুসলিম শাসিত ভারত (আজকের বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত) ছিল শিক্ষা সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। মুসলমানগন দীর্ঘ সাতশ' বছর এ দেশ শাসন করেন। মুসলমানদের শাসন আমলে এ দেশ শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়।

মুসলিম শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে ১৪৯৮ সাল থেকে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার ও বাণিজ্য ব্যাপদেশে পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজরা এদেশে আগমন করে। ইংরেজরা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে রাজ্য বিস্তারের বিশেষ কৌশল গ্রহণ করে।

১৭৫৭ খ্রীঃ ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের সাথে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের পর বণিকের মানদন্ড শাসকের রাজদন্ডে রূপ লাভ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা শাসন করতে থাকে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার তখন নামে মাত্র ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম বাধ্য হয়ে বাংলার দেওয়ানী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সোপর্দ করেন। এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাতশ বছরের রাজত্বের অবসান ঘটে। কালক্রমে সমস্ত পাক-ভারত-বাংলাদেশ জুড়ে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজ জাতি এ দেশে দীর্ঘ একশত নব্বই বছর শাসন-শোষন চালিয়েছে। শাসনের নামে লুণ্ঠন ও বাণিজ্যের নামে শোষণ ছাড়াও খ্রীষ্ট ধর্মের বিস্তারেই তারা ব্যস্ত ছিল। এদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য তারা কিছুই করেনি। বরং মুসলিম আমলে যে সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শাসন কাঠামো ও শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তাও তারা ধ্বংস করে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন ক্ষমতা, শিক্ষা, চাকুরী প্রভৃতি সকল ক্ষেত্র থেকে শাসক ইংরেজ ও তাদের দোসর হিন্দুরা মুসলমানদের সরিয়ে দেয়।

ইংরেজ আগমনকালে শিক্ষা ব্যবস্থা

মুসলিম শাসন আমলে দেশের শহরে-নগরে বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার জন্য অসংখ্য মক্তব, মাদ্রাসা ও শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ম্যাক্সমূলারের দাবী মতে ১৭৫৭ সালে শুধু মাত্র বাংলাদেশেই আশি হাজার বিদ্যালয় ছিল। স্যার জন এডামের রিপোর্ট অনুযায়ী তখন বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ স্কুল ছিল। প্রতি ৪০০ জনের জন্য গড়ে একটি ও প্রায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় ছিল।

গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক স্কুলও ছিল। খান্দানী মুসলমানগণ তাদের নিজেদের সন্তানদের শিক্ষাদানের সাথে সাথে দুঃস্থ গরিব পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতেন। এ সকল বিদ্যালয়ে শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই দেয়া হতনা বরং উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল।

এডাম পাক-ভারত-বাংলাদেশে আট রকম বিদ্যালয়ের কথা বলেছেন। তিনি আরবী, নতুন ও পূরাতন ফার্সী মাদ্রাসা, বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত এবং বালিকা বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, দক্ষিণ বিহার জেলায় প্রতি ২৫০ জনের জন্য গড়ে একটি করে বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ বিবরণী প্রাক-বৃটিশ যুগের অগ্রসর শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতির এক উজ্জল নিদর্শনের সাক্ষ্য।

পরাধীন জাতির জীবনে যা নেমে আসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও শাসন ক্ষমতা হারানোর সংগে সংগে মুসলমানদের জীবনেও তাই ঘটেছিল। মুসলিম শাসনের অবসানের পর তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা দেয় স্থবিরতা, শিক্ষার গতি হয় বাধাগ্রস্থ। অথচ তখন দেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং একটি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃটিশদের সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতি হতে বঞ্চিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

ইংরেজদের আগমনের পর

শাসন ক্ষমতা হারাবার পর পাক-ভারত-বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে চাকুরী, জমিদারী, জায়গীর সহ সকল সরকারী আনুকুল্য হারাতে হয়। ফলে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে। গোটা দেশ দারিদ্র্য ও দুর্দশা কবলিত হয়ে পড়ে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করার পর যে সীমাহীন অত্যাচার চালাতে থাকে তার ফলে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। বলা যায় ইংরেজ শাসনের প্রথম এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত মুসলিম জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

মুসলমানদের সরকারী চাকুরী থেকে অপসারিত করা হয়। উচ্চ পদের চাকুরীগুলো ইংরেজ ও হিন্দুদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়। বাংলার ক্ষমতা দখলে হিন্দু ধনিক-বণিক প্রভৃতি শ্রেণী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রভূত সাহায্য করে। ফলে কোম্পানীর নিকট থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধা ও আনুকূল্য লাভ তাদের জন্য সহজ হয়। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের প্রায় সমস্ত জমিদারী হিন্দুদের দখলে চলে যায়। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতিকে তরতাজা রাখা আর মুসলমানের জন্য সহজসাধ্য থাকল না। কারণে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় চলত।

ইংরেজীকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা

১৮৩৫ সালে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করে আইন পাশ করা হয় এবং ১৮৩৭ সালের পহেলা এপ্রিল থেকে সরকারী ভাবে ইংরেজীর ব্যবহার শুরু হয়। ইংরেজরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও ইংরেজী ভাষার প্রচলন করে।

ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমান

খ্রীষ্টান মিশনারী, ইংরেজ শাসক এবং এ দেশীয় হিন্দু দালালদের ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানগণ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। এ ত্রিচক্রের কুট-কৌশলও ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানরা যেমন তাদের মাতৃভাষা শিক্ষায় হিন্দুদের থেকে অনেক পেছনে পড়ে থাকে, তেমনি ইংরেজী শিক্ষায়ও অনগ্রসর থেকে যায়।

যে সব কারনে মুসলমানগন ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হতে পারেনি তা হলো, মিশনারীরা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দানকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। মুসলমানগন খ্রীষ্টানদের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই বীতশ্রদ্ধ ছিল। ফলে মিশনারী স্কুলে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষা করা তাদের পক্ষে

ছিল কষ্টকর । হিন্দুদের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব ছিলনা। ফলে তারা সহজেই খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং মিশনারীদের যোগাযোগের ফলে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

ইংরেজী স্কুলগুলোর অধিকাংশই হিন্দু জমিদারদের সহযোগিতায় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় স্থাপন করা হয়েছিল এবং অনেক স্কুলে গীর্জা ছিল। মুসলমান ছাত্রদের স্কুলে পড়ার পথ এভাবে রুদ্ধ করা হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল শুধু একটি সম্প্রদায়ের জন্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করাও ছিল অত্যন্ত ব্যয় বহুল। মুসলমানরা ছিল দরিদ্র। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের কোন সামর্থ তাদের ছিল না। সরকারের এ বৈরী মনোভাব ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের অনগ্রসরতার অন্যতম কারন ছিল।

ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ভারতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে মুসলমানরা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছিলনা। এ অবস্থা দেখে অনেক মুসলমান ইংরেজী শিক্ষায় আগ্রহী হন। ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করেন। কলকাতা মাদ্রাসা গৃহে স্বতন্ত্র ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের একটি প্রস্তাবও রাখা হয়। কিন্তু তৎকালীন গভর্ণর সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেননি।

ইংরেজ কোম্পানী, ব্রিটিশ মিশনারী সবাই বরাবরই মুসলমানদের প্রতি ছিলেন বৈরী ভাবাপন্ন। তারা মুসলমানদের দুশমন মনে করতো এবং হিন্দুদের মনে করতো বন্ধু। মুসলমানদের ট্রাষ্টের অর্থ আত্মসাৎ করে সে অর্থ দিয়েও ইংরেজবেনিয়ারা হিন্দুদের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অনেক মুসলমান মেয়েও ইংরেজী শিক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। মাদ্রাসায় ইংরেজী ক্লাশ খোলা না হলেও ছাত্রগণ ইংরেজী শিক্ষার জন্য আগ্রহী হয়ে পারিশ্রমিক দিয়ে শিক্ষকদের কাছে ইংরেজী শিখতে থাকে। মাদ্রাসা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বটে। কিন্তু ইংরেজী চালু করার জন্য বারবার দাবী জানানো সত্বেও তার প্রতি ইংরেজ সরকার কোন গুরুত্বই আরোপ করেনি।

এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মুসলমানদের প্রতি এবং বিশেষ করে তাদের ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যাপারে সরকার কতটা উপেক্ষার মনোভাব পোষণ করত। সরকার যদি ইংরেজী ভাষাকে শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন

ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করত তাহলে মুসলমানদের আপত্তি থাকত না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করার যে অপবাদ দেয়া হয় তা ছিল ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, মিশনারীদের তৎপরতা, হিন্দুদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্বের ফলেই মুসলমানগন ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

বৃটিশ শাসন আমলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা পাক-ভারত-বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংরেজ বেণিয়াগোষ্ঠী মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে। তারা মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে শিক্ষা থেকে তাদের বঞ্চিত করে। এদেশ দখল করে প্রথম দিকে তারা শিক্ষা বিষয়ে মোটেই নজর দেয়নি। শাসন চালাবার জন্য কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন দেখা যায় আদালতের ভাষা (Court Language) ফার্সী। সেখানে চালু আছে মুসলিম আইন। প্রশাসন পরিচালনা ও বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন ফার্সী জানা মৌলভী, মুন্সী, দারোগা, কাজী এবং আদালত পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল মুসলিম আইনে অভিজ্ঞ উকিল-মুক্তার। সরকারের কর্মচারীর চাহিদা পূরণ করার জন্য ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিং উচ্চমানের ফার্সী মাদ্রাসা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

এ সময় কলকাতার শিক্ষিত ও বিশিষ্ট মুসলমানগণ কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য হেস্টিং এর নিকট আবেদন করেন। তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। প্রখ্যাত আলেমও পন্ডিত মোল্লা মাজদুদ্দিনকে মাদ্রাসা প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তিনি দারসে নিজামী মাদ্রাসার অনুকরণে উহাকে পরিচালনা করেন।

এ পদ্ধতিতে এক বা দুটো বইকে মূল পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচন করা হতো। কুরআন-হাদীসের উপর গুরুত্ব কম দিয়ে আরবী ব্যাকরণ, মানতেক, দর্শন, অংক ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হতো। মাদ্রাসার এ পাঠ্য তালিকার মাধ্যমে সরকারের প্রশাসন পরিচালনার জন্য দক্ষ কর্মকর্তা সৃষ্টি

করা মূল উদ্দেশ্য ছিল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও জীবন দর্শন পূর্ণাংগরূপে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ বিষয়গুলোকেও ইসলামী চিন্তা চেতনার আলোকে ঢেলে সাজানো হয়নি। ফার্সীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

এক কথায় বলা যায় মাদ্রাসার সম্পূর্ণ সিলেবাসই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীতে প্রস্তুত করা হয়। ১৮২৬ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী ভাষা শিক্ষা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু সে উদ্যোগ তেমন একটা সফল হয়নি। ১৮৪৭ সালে ইংরেজী ও আরবী শিক্ষা চালু করা হয় আরবী বিভাগের তত্বাবধানে যা সফল হয়নি।

১৮৭৩ সালে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নও অগ্রগতির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে তিনটি মাদ্রাসা স্থাপন করে। এ সকল মাদ্রাসা কলকাতা মাদ্রাসার কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত হত এবং এর পরিচালনার কর্তৃত্ব ছিল পুরোপুরি ইংরেজদের হাতে। মাদ্রাসার সেক্রেটারী ও প্রধান পদে প্রথম থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইংরেজদেরকেই নিয়োগ করা হত।

বৃটিশের শিক্ষানীতি ও উদ্দেশ্য

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী এ দেশের মাটিতে মুসলিম শাসক ও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের শাসন লাভ করার পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। বৃটিশ শাসন আমলে যে সকল বৃটিশ কর্মকর্তা দেশ পরিচালনা ও শিক্ষার সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই এ দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অকেজো, প্রাণ শক্তিহীন ও অচল বলে আখ্যায়িত করে এবং এর প্রতি সর্বদা বৈরী মনোভাব পোষণ করে। তারা ভারতীয়দের বর্বর, ডাকাত, চোর ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করতো।

এ দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুছে ফেলে তদস্থলে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচারে লালিত তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার নামে ইংরেজী শিক্ষা, তথা পাশ্চাত্যের শিক্ষাকে মানুষের উপর কিভাবে চাপিয়ে দেয়া যায় সে চেষ্টায় তারা সচেষ্ট থাকে।

মুলত তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী অফিস সমূহে কর্মচারী চাহিদা পূরণ। এ প্রসংগে এ উপমহাদেশে বৃটিশদের কাজ-কর্মের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত লর্ড মেকলের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন– "বর্তমানে আমাদেরকে এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা আকৃতি ও বর্ণে ভারতীয় হবে বটে কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ।"

ইংরেজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার হয়। সামগ্রিক শাসনকর্মে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ করা সহজ হয়। ১৮৫৪ সালের শিক্ষা বিষয়ক বিবরণীতে এ সুর ধ্বনিত হয়েছিল। এ বিবরণীতে এ কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে নীতির দিক দিয়ে এটা শুদ্ধ যে, এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করতে হবে যারা ভারতীয় সম্পদ সমূহের উন্নয়ন করবে ইউরোপীয় পন্থায় এবং যাদের মধ্যে বিলেতী পণ্যের ব্যবহার ক্রমাগত বর্ধিত হবে। ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কল-কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি করবে এবং ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

১৮৫৩ সালে পার্লামেন্টের সাব-কমিটিতে প্রদত্ত বিবরণে বলা হয়েছিল "দেশের বর্তমান প্রচলন এবং রেওয়াজ অনুযায়ী মুসলমানরা আমাদেরকে অভিশপ্ত, কাফের এবং বিধর্মীদের দলভুক্ত মনে করে যে, আমরা বলপূর্বক একটি সমৃদ্ধশালী ইসলামী সাম্রাজ্যে আধিপত্য কায়েম করে বসেছি। তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আমরা হরণ করেছি। এমতাবস্থায় তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের অর্থ দাঁড়াবে তাদের মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়া।"

ইংরেজ বণিকদের পেছনে পেছনে মিশনারীরাও এদেশে আগমন করে এবং খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হয়। কোম্পানী শাসন প্রবর্তনের পর থেকেই মিশনারীরা উৎসাহী হয়ে উঠে। তারা ভারতে মিশনারী কার্যের সুবিধার্থে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। মিশনারীদের মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষার আকর্ষণ বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো হয়। "খ্রীষ্টান হলেই চাকুরী নির্ঘাত" মিশনারীদের এ প্রলোভনে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হতে থাকে।

এ ছাড়াও এদেশের জনগণের মন-মানসিকতার পরিবর্তন এবং বিপ্লবী

চেতনা দমন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা চালুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩১ সালের শিক্ষা কমিটির রিপোর্টে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় " এ শিক্ষার প্রসার হলে ক্রমান্বয়ে তারা আমাদেরকে আর জবরদস্তি শাসনকারী হিসেবে মনে করবেনা। বরং তারা আমাদেরকে বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জ্ঞান করবে। মনে করবে তাদের হেফাজতে থেকে আগামীতে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারবো।"

বৃটিশদের প্রবর্তিত এ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন ইউরোপীয় ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন এবং এদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নির্ভর করে গড়ে তোলা। লর্ড মেকলের ভাষায় "এমন এক ধরনের মানুষ হবে যারা রক্তে ও গায়ের রঙে হবে ভারতীয়, কিন্তু মেজাজে, চিন্তা-ভাবনায়, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।" এ কাজে তারা সফলও হয়েছিলেন বটে।

তাদের হাতে গড়া সুবিধাবাদী শ্রেণীর মাধ্যমেই তারা বাকী জনসাধারণের পরিবর্তনের কাজটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে কথাই তিনি ১৮৩৫ সালে জানিয়ে দিয়েছেন 'এই শ্রেণীর হাতেই আমরা ন্যস্ত করতে পারি এদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে পরিশুদ্ধ করা, পাশ্চাত্য নাম, যুক্তি বিজ্ঞানের পরিভাষা দ্বারা এ ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ করা এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষাকে নিয়ে যাবার জন্য ভাষাগুলোকে উপযোগী করে তোলার কাজ।'

শিক্ষা বিতর্ক ঃ কোম্পানী শাসন আমলে শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষা মাধ্যম কি হবে তা নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়নের সময় তিনটি ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়। প্রথমত, টোরী বা রক্ষণশীল দল। তারা ধীর গতিতে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনের সুপারিশ করে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আরবী, সংস্কৃত এবং দেশীয় সংস্কৃতির উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

দ্বিতীয়ত, উদারপন্থী দল। তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ভাবধারা প্রবর্তনের পক্ষে মত দেন। তবে তাঁরা দেশীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের এবং উন্নয়ন পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় সাধনের দিকে বেশী জোর দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন।

তৃতীয়ত, উগ্রপন্থী দল এ দলেই ছিলো সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের ঝানু প্রধান

ব্যক্তি ও খ্রীষ্টান মিশনারী গোষ্ঠী। এ গোষ্ঠীর পক্ষে প্রধান ভূমিকা পালন করেন লর্ড মেকলে। তাদের যুক্তিগুলো তিনি তুলে ধরেন তার নিম্নলিখিত উক্তির মাধ্যমে "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকর হয় তা হলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে কোন মূর্তি পূজকের অস্তিত্ব থাকবে না এবং আমাদের পক্ষ থেকে কোন রকমের ধর্মান্তরের চেষ্টা না করেও এ ধরনের সামাজিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজন হবে না। কেবল নতুন শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এই অসাধ্য সাধন হবে।"

অতএব ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজন মেটাতে এবং রাজনৈতিক কারণে এ দেশে ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করা হয় এবং এ শিক্ষার বিস্তার ও সুযোগ সীমিত রাখা হয় শহরবাসী হিন্দু ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে দেশীয়দের শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত হয় এবং শিক্ষাখাতের সমস্ত বরাদ্দটাই ইংরেজী শিক্ষা খাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এ সময়ে কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ বন্ধ করার প্রস্তাব করা হয়। মুসলমান ও হিন্দুদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তা রহিত হয়। কিন্তু মাদ্রাসা ছাত্রদের বৃত্তি বন্ধ করে দেয়া হয়। মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্রই ছিল গরীব। বৃত্তি বন্ধ হওয়ার ফলে তারা ভীষণ অসুবিধায় পড়ে যায়।

১৮৫৪ সালে উড ডেসপ্যাচ লর্ড মেকলের প্রস্তাবিত ও প্রবর্তিত এ শিক্ষা পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিস্তারকে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এ দেশের শিক্ষিত জনগণকে নীতি-নৈতিকতায় পূর্ণ ইউরোপিয়ান হিসেবে তৈরীর পরিকল্পনা নেন। তিনি পৃথক শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার স্তর নির্ধারণ করেন এবং সরকারী অনুদানের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী অনুদানকে উৎসাহিত করেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ও ব্রিটিশ শাসন

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ বেরলবী প্রথম লড়াইয়ের সূচনা করেন। সে লড়াইয়ের

ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব। পাশ্চাত্য লেখকগণ উহাকে 'ভারতীয় সিপাহীদের পুঞ্জিভূত অসন্তোষের বহির্প্রকাশ' বলে মন্তব্য করে থাকলেও উহা মূলত ছিল ভারতীয় সিপাহী ও গণ-মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও হযরত শাহ ইসমাইল শহীদের শিষ্য সাইয়েদ আহমদ উল্লাহ খান ও বখ্‌ত খান। বিপ্লবীদের সাংগঠিনক দুর্বলতা, সুশৃংখল কর্মী ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তাঁদের এ উদ্যোগ সফল হতে পারেনি। কতিপয় দালালের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের এ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। এরপর পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বিলুপ্ত হয়। ভারতে বৃটেনের মহারাণীর প্রত্যক্ষ শাসন চালু হয়। কোম্পানী শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন শুরু হয়।

ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নতুন রূপ লাভ করে। ইংরেজ সরকার সূচনাকাল থেকেই মুসলমানদের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়-সম্পত্তি ও ওয়াকফ বাজেয়াপ্ত করার নীতি গ্রহণ করে। ফারসীকে বিতাড়িত করে তাঁরা ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করে। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের আলোকে যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করা হয় মহারাণীর শাসন চালুর কালে এ নীতি আরো বলিষ্ঠ আকার ধারণ করে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরিকল্পিতভাবে সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তারের পরিবর্তে শিক্ষা ও আদর্শ বিস্তারের নীতি অবলম্বন করেন।

মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্র

সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ-সংশয় বৃদ্ধি পায়। সিপাহী বিপ্লবে মুসলমানদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। মাদ্রাসার ছাত্ররাও এতে অংশ গ্রহণ করে। ফলে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। সরকার মাদ্রাসা বন্ধ করার কৌশল গ্রহণ করে, যাতে আগামীতে কোন প্রকার বিপ্লব দানা বেঁধে উঠতে না পারে। এজন্য কলকাতা মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। যাতে মাদ্রাসা সাধারণ শিক্ষায় রূপান্তরিত হয় এবং চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্থানীয় ভারতীয় প্রশাসনের অসহযোগিতার ফলে এ উদ্যোগ সফল হতে পারেনি।

তারপর আরো একটি পরিকল্পনা নেয়া হয় ইংরেজী ও ফারসী বিভাগকে আরো উন্নত করার নামে। আরবী বিভাগ থেকে ফিকাহ্, মান্তিক, ফালসাফা বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয় যাতে আরবী বিভাগ ইংরেজী-ফারসী বিভাগে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং মাদ্রাসা তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

১৮৬৪ সালে ভারত সরকার মুসলিম কাজী এবং পরিসংখ্যানবিদ নিয়োগ বাতিল করে। তখন বিচারালয়ে জজের সাথে কাজীও কাজ করতেন এবং এ পদে আলীয়া মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদেরকেই নিয়োগ করা হতো। এর ফলে মুসলমান ছাত্রদের কার্যক্ষেত্র আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে।

বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ

হান্টার কমিশন ঃ বৃটিশ সরকার ভারত শাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বৃটিশ ভারতের সামগ্রিক শিক্ষা, বিশেষ ভাবে মুসলমানদের শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। লর্ড রিপন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ স্যার উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি করে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন ব্যাপক ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের সাক্ষাৎকার এবং পরামর্শ গ্রহণ করেন।

বাংলা প্রদেশের শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যও একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর এবং সৈয়দ আমীর আলীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। মুসলমানদের শিক্ষা পুনর্গঠন বিষয়ক কমিশন সতের দফা সম্বলিত সুপারিশমালা পেশ করে। এতে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণকল্পে সরকারের বিশেষ ব্যয় বরাদ্দ, উর্দূকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ, ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর করার জন্য পর্য্যাপ্ত সাহায্য বরাদ্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি প্রদান, মুসলমান ইন্সপেক্টর নিয়োগ, চাকুরী ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদান সহ বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়।

১৮৮২ সালে কলিকাতার মোহামেডান এসোসিয়েশন লর্ড রিপনের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতা এবং কারণ সমূহ তুলে ধরে এবং মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির সহায়ক কতগুলো প্রস্তাবও পেশ করে। এ সুপারিশমালা কমিশনের নিকটও পেশ করে। এসময়ে লর্ড রিপন ভারত হতে বিদায় গ্রহণ করেন।

পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশের ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। পরিকল্পনায় বলা হয়– "মুসলমানরা সরকারী চাকুরী ততদিন অবধি লাভ করতে পারবেনা যতদিন না তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দুদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে। সরকার প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষার প্রতি যতদিন না তারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হবে এবং এ শিক্ষায় পারদর্শী হবে ততদিন তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবেনা।"

পরিকল্পনায় জনশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে আলাদা ভাবে "মুসলমানদের শিক্ষা" শীর্ষক একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করার কথা উল্লেখ করা হয়। মুসলমানদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি ও ভাতার বন্দোবস্ত করার এবং আগামীতে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী পরিকল্পনায় মুসলমানদের স্বার্থ সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়। যে সব অঞ্চলে মুসলমানরা শিক্ষায় বেশী অনগ্রসর সেখানেই স্কুল ইনস্পেক্টর নিয়োগ করার সুপারিশ করা হয়।

১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট নিযুক্ত হয়ে আসার পর শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯০১ সালে সিমলায় এক শিক্ষা সম্মেলন আহবান করেন। লর্ড কার্জনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সরকারী সাহায্য দেয়া হতে থাকে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও বিভাগে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।

এ ছাড়াও সরকার সাধারণ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে ১৯১৯ সালে ডঃ মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে স্যাডলার কমিশন এবং ১৯৪৩ সালে ভারত সরকারের তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা জন সার্জেন্টকে চেয়ারম্যান করে কমিটি গঠন করেন। এ সব কমিটিও কমিশন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ পেশ করে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কাঠামো ও পদ্ধতিতে মৌলিক কোন পরিবর্তন করার পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

পাক-ভারত ও বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষা আন্দোলন

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা ইংরেজদের হাতে তাদের সর্বস্ব হারায়। একদিন যাদের দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিল, সেই মুসলমানরা কাঠুরিয়া ও ভিস্তিওয়ালায় পরিণত হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতি-সভ্যতার সকল ক্ষেত্র থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করা হয়। তাই মুসলমানরা ইংরেজদের এ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণকে প্রত্যাখ্যান করে। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও অধিকার আদায়ের জন্য তাঁরা তীব্র লড়াই শুরু করল। তাঁরা নিজেদের ঈমান-আকিদা, তাহজীব-তামুদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি উদ্ধারে নিয়োজিত করল সমস্ত শক্তি। মূলত পলাশীর পতনের দিন থেকেই মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলন ও স্বাধীনতার লড়াইর সূচনা হয়।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও দেওবন্দ আন্দোলন

মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তা, সাংস্কৃতিক উত্থান, শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী ছিলেন প্রধান পথিকৃৎ। তিনি উদ্দীপনা-অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর আন্দোলন থেকে। শাহওয়ালী উল্লাহর ভাবনা ছিল ভারতে ইসলামের অবলুপ্ত গৌরব ও শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী শিক্ষা ও চরিত্রে মানুষকে গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তিনি উপযুক্ত লোক তৈরী করে ব্যাপক ভিত্তিক আন্দোলনের সূচনা করলেন। তিনি দিল্লীতে বিখ্যাত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন।

এ প্রতিষ্ঠান থেকেই বেরিয়ে আসলেন শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবীর মত মহান ব্যক্তিত্ব যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম তিনিই ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণা দেন এবং উপমহাদেশে আযাদী সংগ্রামের গোড়া পত্তন করেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে তোলেন। একশ বছর ধরে বৃটিশের বিরুদ্ধে চলে তাঁদের এ সংগ্রাম। বাংলার শহীদ তীতুমীর ও হাজী শরিয়তুল্লাহর সংগ্রাম ছিল সে আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা।

১৮৫৮ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটায় উপমহাদেশে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সরাসরি শাসনের ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু হয় স্বাধীনতাকামী জনতার উপর ব্যাপক হারে নির্যাতন, গণহত্যা, ফাঁসি, দীপান্তর, জেল ও জুলুম। উপযুক্ত নেতৃত্ব ও জুলুম নির্যাতন এর মোকাবেলায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাবে ১৮৭০ সালের দিকে এ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়।

এ কঠিন ও জটিল সময়ে আল্লামা কাশেম নানুতুবী শাহ ওয়ালী উল্লাহর শিক্ষাবিস্তার কর্মসূচী পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের গোড়া পত্তন করেন। পর্যায়ক্রমে সাহারানপুর, শাহী মুরাদাবাদ, মীরাট প্রভৃতি স্থানেও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আল্লামা নানুতুবী (রঃ) তাঁর আন্দোলনের বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন 'ময়দানের আন্দেলনকে আমি প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ পোশাকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছি'।

আল্লামা নানুতুবীর শিক্ষা বিস্তারের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে হাজারো আলেম-উলামা গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল মাদ্রাসা মুসলমানদের অন্তরে ইসলামী চেতনা উজ্জীবিত করে এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষাবিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত, শাহ আবদুল আযীজের বিপ্লবী কর্মসূচী ও জিহাদী জজবায় উজ্জীবিত এ আন্দোলনের পরবর্তী ভূমিকা ছিল প্রশ্নবোধক এবং মুসলিম উম্মাহ ও জাতির জন্য হতাশাব্যঞ্জক। শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শহীদ সাইয়েদ আহমদ, শহীদ তিতুমীর, হাজী শরিয়ত উল্ল্যাহর উত্তরসুরী আলেম সমাজ 'ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার' পরিপূর্ণ আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হন। জিহাদী উদ্দীপনা ও সংগ্রামী ভূমিকা ছেড়ে তাঁরা আপোষের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন, খেলাফত আন্দোলনের মত বিরাট আন্দোলনেও নেতৃত্ব দেন কিন্তু তাঁদের পুর্বসুরীদের মত সে সংগ্রামী ভূমিকার অনুসরণ করেননি

১৯২০ সালে দেওবন্দী উলামাদের নেতৃত্বে গঠিত হয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। ইসলামী আদর্শের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ, ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার, মুসলমানদের শিক্ষার অধিকার অর্জন, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধারকে জমিয়ত লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে বটে, কিন্তু এ সকল লক্ষ্য

অর্জনের মূল ভিত্তি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য ছিল তাকেই তাঁরা পাশ কাটিয়ে গেলেন এবং চরম মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী আন্দোলনের ভক্ত অনুসারী হিসেবে পরিণত হলেন।

১৯৪৫ সালে পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলনের দুই নেতা মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ও মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। মাওলানা উসমানী মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন। মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সহ দেওবন্দী আলেমদের প্রধান অংশ জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অখন্ড জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেন। তাঁরা মুসলিম লীগের আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যান

মুসলমানদের এ দুর্দিনে মাওলানা মওদুদী (রঃ) মুসলমানদের আশু রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে হিন্দু জাতিসত্তার মধ্যে মুসলমানদের গ্রাস করার কংগ্রেসী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদ শুরু করেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁর 'আমার কাহিনী' বইতে হিন্দু-মুসলিম এক জাতীয়তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলে মাওলানা এর তীব্র সমালোচনা করেন। মাওলানা মওদুদীর এ স্পষ্ট ও আপোষহীন ভূমিকার জন্য পণ্ডিত নেহেরু তাঁকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদী বলে আখ্যায়িত করে।

মাওলানা মওদুদী কংগ্রেসপন্থী আলেম-ওলামাদের পরস্পর বিরোধী কথা ও কাজের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁদের নানা অপপ্রচারের জবাব দান করেন। বিশেষ করে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদের উপর লেখা মাওলানা মওদুদীর 'মাসায়ালায়ে কাউমিয়াত' গ্রন্থটি পাকিস্তান আন্দোলনকে দুর্বার গতি দান করে।

কংগ্রেসপন্থী মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর এক জাতীয়তাবাদের মতবাদের খন্ডন মাওলানা মওদুদীই করেছিলেন। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মাওলানা মওদুদীর মাসায়ালায়ে কাউমিয়াত বইটির লাখ লাখ কপি গোটা ভারতে বিতরণ করে। কংগ্রেসী আলেমদের একজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে মাওলানা মওদুদীর জোরালো লিখনী ও ক্ষুরধার যুক্তি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বিরাটভাবে সাহায্য করে। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তাই কংগ্রেস পন্থী আলেমদের সকল পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, ক্রোধ ও ঘৃণা

গিয়ে পড়ে মাওলানা মওদুদীর উপর। তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হয় ফতোয়ার জোয়ার। মাওলানা মওদুদী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলন 'জামায়াতে ইসলামীর' বিরোধিতা করাই যেন তথাকথিত দেওবন্দী আলেমদের কর্মসূচী হয়ে পড়ে। এভাবেই তাঁরা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী, সৈয়দ আহমদ শহীদ ও হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হতে বিচ্যুত হন।

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি থেকে আলীগড় আন্দোলন

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব মুসলমানদের মাঝে নতুন চিন্তা-চেতনার সৃষ্টি করে। এ পর্যায়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের আযাদী লাভের উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। মুসলিম জাতি আবার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর হিম্মত ফিরে পায় এবং মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের অবিশ্বাস-অনাস্থা দূর করে সুযোগ-সুবিধা আদায় করার চিন্তা শুরু হয় ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলমানদের অগ্রসর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

মুসলমানদের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত একমুখী শিক্ষাধারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে দেওবন্দ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা যা ইংরেজ সরকারের প্রতি বৈরী মনোভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমানদের ব্যক্তিগত সাহায্য ও আলেম-ওলামাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় পরিচালিত হচ্ছিল। এখানে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পূর্ণ বর্জিত হয় এবং কুরআন, হাদীস ও ফারসী শিক্ষাকেই একমাত্র বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে ইংরেজদের সহযোগিতা নিয়ে, ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হন মুসলমানদের আর একটি অংশ। তাঁদের মধ্যে তৎকালীন বাংলার নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে কলকাতায় মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই মুসলমানদের সিপাহী বিপ্লবোত্তর নিজস্ব প্রথম সংগঠন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের আস্থা, বৃটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য এবং মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমে সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ পরিহার করে আপোষ ও সুবিধাবাদের পথ গ্রহণ করা হয়।

বৃটিশ সরকারের পদলেহন করে হিন্দুরা যখন সব সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করছিল তখন মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি মুসলমানদের স্বার্থ আলাদা ভাবে তুলে ধরেন। এ সময়েই মহসীন ফান্ডের টাকা মুসলমানদের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হুগলী কলেজকে সরকারীকরন করা হয়। হুগলী কলেজ, কলকাতা মাদ্রাসার উন্নয়ন, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপন এবং মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির মাধ্যমে আরও কিছু দাবী আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। যথা– ১) সকল সরকারী বিদ্যালয় ও কলেজে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা ও মাতৃভাষা শিখবার উৎসাহ দেয়া, ২) মুসলিম অধ্যুষিত জেলাসমূহে স্থাপিত ইংরেজী বিদ্যালয়গুলোতে অধিকতর যোগ্য মুসলমানকে ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত করা, ৩) নিজেদের মাতৃভাষা শিক্ষা বিদ্যালয় ও ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মুসলমানদের অধিকতর অর্থ সাহায্য দেয়া, ৪) মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য মুসলমানদের অধিকতর উৎসাহ দেয়া।

এ সময়ে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসেন সৈয়দ আমীর আলী। সাতান্ন সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানদের চরম দুর্গতি ও দুর্দিনের সময়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮৭৮ সালে রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনটি দাবি আদায়ের প্রেসার গ্রুপ হিসেবে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সংগঠনটি দাবী পেশ করে যে, মুসলমানদের চাকরির শর্ত শিথিল এবং শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি। ১৮৮২ সালে তিনি এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে লর্ড রিপনের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী যখন বাংলা প্রদেশে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও অধিকার আদায়ের পতাকা উত্তোলন করেন তখনই আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সে আন্দোলনকে বৃটিশ ভারতে ছড়িয়ে দেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের পরিবর্তে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের পশ্চাদপদতাকেই তিনি তাদের অবনতির আসল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গাজীপুরে একটি অনুবাদ সমিতি গড়ে তোলেন। এ সমিতির মাধ্যমে বহু বিদেশী গ্রন্থ অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় করে তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৮৭৫ সালে আলিগড় মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম সমাজের সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তার আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনকে 'আলিগড় আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

নবাব আবদুল লতিফের মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, সৈয়দ আমীর আলীর ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আলিগড় আন্দোলন মুসলমানদের জাতিসত্ত্বা ও অস্তিত্ব রক্ষায় কিছুটা অবদান রাখতে সক্ষম হয়। বৃটিশ সরকার যখন মুসলমানদের বিদ্রোহী হিসাবে পিষে ফেলতে ব্যস্ত, হিন্দুরা যখন জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মুছে ফেলতে উদ্যত তখনকার সেই ঘোর অমানিশার দিনগুলোতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে অবদান রাখে এসব সংগঠন ও আন্দোলন। তাঁদের এ পদক্ষেপ অন্তত মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে আলাদা জাতীয় স্বার্থ ও স্বীকৃতি আদায় করতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছে।

মাওলানা মওদুদী আলিগড় আন্দোলনের কৃতিত্বকে এভাবে তুলে ধরেছেন যে, 'স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে আলিগড় থেকে যে শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল মুসলমানেরা যেন সময়ের চাহিদার আলোকে নিজেদের পার্থিব স্বার্থ রক্ষা করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং দেশের নতুন আইন-কানুন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে অন্য জাতি থেকে পশ্চাদপদ না থেকে যায়'।

এ সকল আন্দোলন মুসলমানদের অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন ভূমিকা পালন করেছে তেমনি পাশাপাশি এর ফলে তাদের অনেক কিছু হারাতেও হয়েছে। মাওলানা মওদূদী (রঃ) আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তথা মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষাকে মুক্তির একমাত্র সোপান হিসেবে গ্রহণ করার পরিণাম কি হবে তা ভেবে আক্ষেপ করে বলেন, 'যদিও এ আন্দোলনে লাভের পাশাপাশি ভয়ংকর ক্ষতির দিকও ছিলো, কিন্তু তখন চিন্তা ভাবনা করে

ক্ষতিমুক্ত সার্বিকভাবে কল্যাণকর কোন শিক্ষানীতি গ্রহণ করার মত অবকাশ ছিল না। তখন এমন কোন উপায়-উপকরণও ছিল না যা দিয়ে এ ধরনের শিক্ষানীতি অনুসারে কাজ করা সম্ভব হয়। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণার্থে মুসলমানদেরকে পুর্ব থেকে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিলো। তবে এর ক্ষতিকর দিক থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের স্বল্প পরিমাণ এমন কিছু উপকরণও এতে রাখা হলো আধুনিক শিক্ষানীতি ও প্রশিক্ষণের সাথে যার আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। এটা ছিল একটা সাময়িক পদক্ষেপ ষা আকস্মিক বিপদের মোকাবেলা করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।"

এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাপ্তির হিসাব-নিকাশ করে মাওলানা মওদুদী আরও বলেন, 'এ আন্দোলন একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত আমাদের পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলে সহায়ক হয়েছিল তবে এর মাধ্যমে আমরা পার্থিব স্বার্থ যতটা উদ্ধার করেছি, আমাদের দ্বীনকে তার চেয়ে অনেক গুণে বেশী বিকৃত করে ফেলেছি। এ ভাবেই আমাদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের ফিরিংগীদের আবির্ভাব ঘটেছে, এ্যাংলো মোহামেডান ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান জন্মলাভ করেছে, তাও আবার এমন যাদের মানসিকতায় 'মোহামেডান' ও 'ইন্ডিয়ান' হওয়ার অনুপাত নামে মাত্র বিদ্যমান'।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সহ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ফলাফল তুলে ধরে মাওলানা মওদুদী (রঃ) আরও বলেন, 'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু ক্রটিপূর্ণই নয় বরং স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মুহসিনুল মূলক, ভিকারুল মূলক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যে সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং যে জন্য মুসলমানরা তাঁদের সামর্থের চাইতেও বেশী উৎসাহের সাথে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সে সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উল্টো ফলাফলই এ থেকে পাওয়া যাচ্ছে।'

এভাবেই শিক্ষা ব্যবস্থায় সত্যিকার মুসলিম তৈরীর নীতি ও আদর্শ উপেক্ষিত হয়। একজন মুসলমান জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমকালীন সময়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে চিন্তা-চেতনায়, কৃষ্টি-কালচারে, ইবাদাত-বন্দিগীতে সত্যিকার মুসলমান হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। দীর্ঘ সময় থেকে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত একমুখী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

উপেক্ষিত হয়। ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গড়ে ওঠে কাওমী মাদ্রাসা, পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা ও ইংরেজীকে ধারণ করে গড়ে ওঠে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। তা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে বৃটিশের চালু করা সরকারী মাদ্রাসা। পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কাজ হারিয়ে যায় ইতিহাসের অন্তরালে।

বংগভংগ হতে পাকিস্তান

বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময় মুসলমানদের জন্য যেমনি শোকের তেমনি সুখের। শিক্ষাক্ষেত্রেও এ সময়ে মুসলমানদের প্রাপ্তি ও হারানো দুটিই আছে। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে তৎকালীন বিশাল বাংলা প্রদেশকে দুটি প্রদেশে ভাগ করলেন। একেই খারাপ অর্থে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ আখ্যায়িত করেছে।

প্রদেশ বিভাগ ছিল লর্ড কার্জনের সবচেয়ে সুফলপ্রদ ব্যবস্থা। এর ফলে মুসলমানরা লাভবান হয় বেশী। আসামও বাংলা প্রদেশের মিলিত রাজধানী হলো ঢাকা এবং মুসলমানরা এ নবগঠিত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। যে মুসলমানরা দীর্ঘদিন থেকে রাজনৈতিক ময়দান থেকে দূরে সরে ছিল, তাদের মাঝে রাজনৈতিক চেতনা ফিরে আসল। বৃটিশ আমলে কলকাতা কেন্দ্রীক শাসনে পূর্ব বাংলার উপর যে দুর্দিন চেপে বসেছিল, তার প্রতিকারের পথ সুগম হল।

স্বার্থান্বেষী হিন্দু মহল বঙ্গভঙ্গের ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গোটা বাংলার হিন্দুরা বাংলা উগ্রমূর্তি ধারণ করে। তারা এটাকে জাতীয় ঐক্যে চরম আঘাত, তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার শাস্তি, মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব এবং মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নামে অভিহিত করে। রাতারাতি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুগণ আন্দোলন শুরু করে এবং মুসলমানদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা জনসভায় ও পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের প্রতি নানাপ্রকার অসম্মান, আপত্তিকর ও বিদ্রুপাত্মক ভাষা প্রয়োগ করতে থাকে। মুসলমানদের দেশদ্রোহী, ইংরেজদের দালাল আখ্যায়িত করতে থাকে। তাদের উগ্র মনোভাব হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে চিরদিনের জন্য বিনষ্ট করে দেয় ও মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা উসকিয়ে দেয়। এতে মুসলমানদের জীবন ও সম্পদ বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং এ সংকট- সন্ধিক্ষণে মুসলমানদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৯০৬ সালে ঢাকায় "সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয় নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে। ঢাকার এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মুসলিম লীগ গঠনে হিন্দুদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। 'তারা মুসলিম লীগকে সলিমুল্লাহ লীগ এবং সরকারের ভাতা ভোগী ও তাবেদারদের সমিতি' বলে গালি-গালাজ শুরু করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রচন্ড বিরোধিতা ও কংগ্রেসপন্থী কিছু মুসলমানের বাধা মোকাবেলা করেই মুসলিম লীগকে সামনে অগ্রসর হতে হয়।

বংগ বিভাগ হওয়ার পর হিন্দুদের একচেটিয়া স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা যখন বিঘ্নিত হয়, তখন গোটা হিন্দু বাংলা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, এমনকি আমাদের দেশের একশ্রেণীর লোকের পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন। কবিতা লেখা, সভা সমাবেশ করা এবং বলতে গেলে গোটা ভারতের হিন্দু জাতি এ বিভক্তি বানচাল করার আন্দোলনে নেমে পড়ে। একই সংগে তারা মুসলমান এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে। এ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ক্ষুদিরাম ও ওয়াদ্দেদার। এমনকি এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে পুরো মুসলমান জাতিকেই উৎখাতের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। সরকার সন্ত্রাসবাদীদের নিকট নতি স্বীকার করে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার পথ বেছে নেয় এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

তখন বাংলার মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করার দরুন মুসলমানদের যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বৃটিশ সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

সরকার কর্তৃক ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়ে হিন্দুরা। বংগভংগ আন্দোলনের সময় মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে যেভাবে যবন হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধেও তেমনিভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়।

ঢাকার হিন্দুরাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ভুমিকা পালন করে। পুর্ব বাংলার প্রায় দু'শত গন্যমান্য হিন্দু ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে ভাইসরয়কে একটি স্মারকলিপি দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে "মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়" আখ্যায়িত করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের মনের ঝাল মেটাতে থাকে। হিন্দুদের এ সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়.।

বংগভংগের জন্য সমগ্র হিন্দু জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কংগ্রেসের এক জাতীয়তাবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। হিন্দু মুসলমান যে দু'টি ভিন্ন জাতি তা পরিষ্কার হয়ে পড়ে। বঙ্গ-ভংগের ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মাঝে যে হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম নেয় তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আদর্শিক পার্থক্য ও রাজনৈতিক দূরত্ব বাড়তে থাকে। হিন্দুরা সরকারের বিশ্বস্ত প্রজা হিসেবে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছিল। বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় যে সামান্যতম ভূমিকা রাখবে হিন্দু সমাজ তাও মেনে নিতে পারছিল না। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ মুসলমানদের আশাহত করে। তাদের দুঃখ-বেদনা-হতাশায় আলাদা জাতিসত্তার চেতনা জাগ্রত করে। তারা বুঝতে পারে হিন্দু-মুসলমান সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। এর ভিত্তিতেই দ্বি-জাতি তত্বের (Two Nation Theory) জন্ম হয়। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের বিমাতা সুলভ আচরণ, তাদের তাহজীব-তামাদ্দুনের প্রতি উপেক্ষা, কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে রামরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা, মুসলমানদের প্রতি হিন্দু কংগ্রেসের অন্যায়- অবিচার তাদেরকে স্বতন্ত্র আবাসভূমি লাভের সংগ্রামে বাধ্য করে। এভাবেই দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হয়।

ইসলামী শিক্ষার পক্ষে মাওলানা মওদুদীর বলিষ্ঠ আওয়াজ

মুসলমানদের রাজনৈতিক দুর্দিনে মাওলানা মওদুদী (রঃ) যেমন তাঁর লিখনির মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি মুসলিম জাতিসত্তার পক্ষে তাঁর ক্ষুরধার লিখনী, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য, তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা দ্বিজাতি তত্বকে উপ-মহাদেশে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং পাকিস্তান আন্দোলন বিশেষভাবে উজ্জীবিত হয়েছিল। এ সময় তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি পরিপূর্ণ শিক্ষা বিপ্লবের বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলেছিলেন। তিনি তাঁর লেখায় যৌক্তিক বক্তব্যের মাধ্যমে তখনকার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে এবং মুসলমান সমাজের জন্য তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল কি হতে পারে তা জাতির সামনে পেশ করেন। সাথে সাথে একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার নকশা তথা শিক্ষানীতি এবং তা কার্যকর করার বাস্তব কর্মসূচীসহ পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী প্রভৃতি বিষয়সমূহও স্পষ্ট করে তোলেন।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

শিক্ষায় মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বৃটিশ সরকারের সহযোগিতায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের মাঝে ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তা প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই ধারায় তখন বিভিন্ন এলাকায় আরো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়।

কিন্তু এ সকল শিক্ষায়তন থেকে কাংখিত ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। কারণ মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই নাস্তিক এবং প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসী লোক বের হয়ে আসছিল। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অভিযোগ ছিল খুব মারাত্মক। এখান থেকে সনদপ্রাপ্ত শতকরা নব্বই ভাগ শিক্ষার্থীই নাস্তিক বা প্রকৃতিবাদের পূজারী হিসেবে বের হন। মাওলানা এর কারণ অনুসন্ধান করে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেন।

মুসলমানদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্পর্কে মাওলানা বলেন, "যে কারণে মুসলমানদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণা গড়ে উঠেছিল এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা এ যে, মুসলমানগণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবিধা লাভের সাথে সাথে মুসলমান হিসেবেও বেঁচে থাকতে চায়। সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই দরকার মুসলমানদের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়।"

কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয় সে উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারলনা। যে ফলাফল আশা করা হয়েছিল তাও অর্জিত হল না। একটা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ছাত্রদের সাথে এর কোন পার্থক্য থাকল না। ইসলামী চরিত্র, ইসলামী স্পিরিট এবং ইসলামী কর্মপদ্ধতি ও আচার-আচরণ তাদের চরিত্রে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও ইসলামী মন-মানসিকতা একেবারেই ছিল না বললেই চলে। তাদের মধ্যে এমন শিক্ষার্থীও ছিল যাদের অস্তিত্বই ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন এবং মুসলিম জাতিসত্তার জন্যে কল্যাণবহ না হয়ে বরং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াল। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করার পরিণাম সম্পর্কে মাওলানা মওদুদী বলেন, 'এর মাধ্যমে আমরা পার্থিব স্বার্থ যতটা উদ্ধার করেছি, আমাদের দ্বীনকে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী বিকৃত করে ফেলেছি'।

এ শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদেরকে ইউরোপের বস্তুবাদী সভ্যতার গোলামে পরিণত করেছে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন 'এ শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তা ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

তিনি প্রাচীন পদ্ধতিতে কুরআন, হাদীস ও ফিকার শিক্ষাদানকে আধুনিক যুগের প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ বেমানান বলে উল্লেখ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে এ ধরনের শিক্ষা থেকে উত্তম ফল লাভ করা যায় না।

তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি সত্যিই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হয়, তাহলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান হুবহু শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে সর্বপ্রথম চিন্তা-ভাবনা করতে

হবে। এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান অবিকল গ্রহণ করাই ঠিক নয়। পাশ্চাত্যের সব জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই শিক্ষার্থীদের সামনে সমালোচনার আলোকে উপস্থাপন করা দরকার। সাথে সাথে ইসলামের প্রাচীন গ্রন্থাবলীকে হুবহু গ্রহণ না করে ইসলামের স্থায়ী মূলনীতি, সঠিক আকীদা-বিশ্বাস এবং অপরিবর্তনীয় আইন-কানুনকে শেষ যুগের পন্ডিতগনের চিন্তার সংমিশ্রন থেকে মুক্ত করে গ্রহণ করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মন-মগজে ইসলামের প্রকৃত স্পিরিট ও ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করা যায়। তিনি এজন্য নতুন সিলেবাস তৈরীর কথা বলেন।

তিনি কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকেই অগ্রগণ্য করার এবং কুরআন-সুন্নাহকে যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছেন এমন শিক্ষক নিয়োগ দান করার পরামর্শ দেন। অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইসলামী উপাদান সমূহকে অংগীভূত করার কথা বলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফদের মধ্যে যে সব নাস্তিক এবং ফিরিংগীমনা শিক্ষক অনুপ্রবেশ করেছে তাদের সরিয়ে দিতে বলেন।

মাওলানা মওদুদী (রঃ) তীক্ষ্নবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে সংস্কার-সংশোধন করার যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে মুসলমানদের শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসই ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হত। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে এ প্রস্তাব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।

মুসলমানদের জন্য নতুন শিক্ষানীতি ও কর্মসূচীর প্রস্তাব

মাওলানা মওদূদী ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সত্যিকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব ও পরামর্শ পেশ করেন। তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বীনিয়াত পাঠ্যসূচী সংস্কার কমিটির প্রচারিত ও বিলিকৃত প্রশ্নমালার জবাব লিখে পাঠান। সে জবাব যদিও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য তৈরী করা হয়েছিল– তথাপি তা ছিল মুসলমানদের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য। এর মাধ্যমে বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের সামনে তিনি ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপরেখা তুলে ধরেন।

তিনি প্রথমে সমালোচনার দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির মৌলিক ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেন। সে সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিকে 'আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার একটি জগাখিচুড়ি রূপ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন 'এ শিক্ষা ব্যবস্থায় দুটি বিপরীত ধর্মী ও সামঞ্জস্যহীন শিক্ষা উপাদানকে সংশ্লেষহীনভাবে এনে এক সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে যা কোনভাবে কল্যাণকর হতে পারে না। শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যবস্থা যেমন ক্ষতিকর তেমনি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নিন্দনীয়। এতে পাশ্চাত্য শিক্ষার উপাদানসমূহ শক্তিশালী হয়েছে বটে কিন্তু ইসলামী শিক্ষার উপাদানসমূহ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য তাহযীব-তমুদ্দুন ও পাশ্চাত্যপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'।

আলোচনার মাধ্যমে তিনি দুটি বিষয় স্পষ্ট করেন। প্রথমত শিক্ষার ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী উপাদানের সংমিশ্রন নীতিগত ও বাস্তবক্ষেত্রে ভ্রান্ত এবং দ্বিতীয়ত তা কোনভাবেই ইসলামী স্বার্থের জন্য কল্যাণকর নয়।

এ পর্যালোচনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নীতি কি হবে তিনি তা তুলে ধরেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী কালচার রক্ষণাবেক্ষন ও তার উন্নতি-অগ্রগতির জন্য পুরো সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্গঠিত করার পরামর্শ দেন যাতে তা সামগ্রিকভাবে ইসলামী সংস্কৃতির মেজাজ ও ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তিনি এ কথা প্রমাণ করেন যে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সেবা করেছে।

ইসলামী সাংস্কৃতির সেবা ও লালন করার মত যোগ্য আলেম ও পন্ডিতের যে অভাব তার কারণ হিসেবে তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দু' ধরনের পন্ডিত ও বিদ্বান তৈরী হচ্ছে। প্রথম, এমন আলেম ও পণ্ডিত যাঁরা ইসলামের আকায়েদ ও মুলনীতিসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কিন্তু এর সাহায্য নিয়ে তাঁরা জ্ঞান ও কর্মের জগতে এগিয়ে যেতে পারেন না এবং জীবনের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও সমস্যায় সেগুলো প্রয়োগ করতেও জানেন না। দ্বিতীয়ত, যাঁরা পার্থিব জ্ঞানে সমৃদ্ধ, যাঁরা অন্তরে ইসলামের প্রতি ঈমান পোষণ করেন কিন্তু তাঁদের মস্তিস্ক অনৈসলামী পন্থায় চিন্তা করে জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে অনৈসলামী

দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এবং অনৈসলামী নীতিতে এর বাস্তবান ঘটায়। অনৈসলামী পন্থায় চিন্তা করে, জীবনের সকল কর্মকান্ডকে অনৈসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এবং অনৈসলামী নীতিতে এর বাস্তবায়ন ঘটায়।

এ দু' ধরনের আলেম বিদ্বান ও পণ্ডিতই ইসলামী সাংস্কৃতির সেবা ও লালনে একেবারেই অযোগ্য। যার ফলে ইসলামী কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন অধপতন হয়েছে। তিনি ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নয়ন-অগ্রগতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা বলেন। এ ছাড়া তিনি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অন্তর্লীন করার প্রস্তাব করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানও শিল্প-কলার উত্তম উপাদানগুলো আত্মস্থ করে ইসলামী তাহযিবের অংগীভূত করতে পরামর্শ দেন।

এর মাধ্যমে মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম আইনবিদ, মুসলিম প্রশাসক, মোট কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার সকল অংগনের জন্য মুসলিম বিশেষজ্ঞ তৈরী করা সম্ভব হবে যাঁরা জীবনের সব সমস্যার সমাধান ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করবে। তাঁরা আধুনিক সভ্যতার উন্নত উপায়-উপকরণকে ইসলামী সভ্যতার সেবায় নিয়োজিত করবে ও ইসলামকে যুগ চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করবে এবং ইসলামকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নেতৃত্বের আসনে পুনরায় বসাবে।

স্যার সৈয়দ আহমদ সহ মুসলিম নেতৃত্ব যে প্রেক্ষাপটে তৎকালীন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে সময় ও যুগ যেহেতু অনেক এগিয়ে গিয়েছে এ জন্য তিনি মুসলমানদের দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে অবস্থানে বসে না থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেন। তাঁর দৃষ্টিতে মুসলিম জাতি যদি আগের সে অবস্থানেই থাকে তা হলে তাদের জাতীয় উন্নতিতো হবেই না বরং বেঁচে থাকাই কঠিন হবে।

ইসলামী শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন পদ্ধতিও তিনি তুলে ধরেন। এ জন্য মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দী থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরিংগীপনার মূলোৎপাটন করে একটি প্রাণবন্ত ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষকদের জ্ঞান এবং বাস্তব অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য কোন ব্যক্তির

বিশেষজ্ঞ হওয়াকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেননি বরং পাকা মুসলমান হওয়াকে আবশ্যক মনে করেছেন।

আরবী যেহেতু মুসলিম সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রতীক ভাষা, সেহেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবীকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করেন। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় আকায়েদ, ইসলামী আখলাক, ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় বিধিমালা, ইসলামী ইতিহাস, আরবী ও কুরআন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন।

তিনি পরামর্শ দেন যে, কলেজ পর্যায়ে আরবী, কুরআন, ইসলামী বিষয় সাধারণ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত থাকবে যা সব শিক্ষার্থীকে পড়ানো হবে। পাশ্চাত্য জ্ঞানের যেটুকু ইতিবাচক তা গ্রহণ করার এবং ইসলামী বিষয়গুলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অংগীভূত করার সুপারিশ করেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ বিভাগগুলোকে আলাদাভাবে শিক্ষা না দিয়ে পাশ্চাত্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর গবেষণার জন্যে একটি বিশেষ বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এ বিভাগ থেকে এমন লোক বের হবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন যাঁরা শুধু মুসলমানদের নয় বরং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র দুনিয়ায় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নের পন্থা

শিক্ষা সংস্কার সংশোধনের পরামর্শ দেয়ার সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করার উপায়ও তিনি নির্দেশ করেন। এ জন্য প্রথমে মাধ্যমিক স্কুলে ইসলামী আকীদা, আখলাক ও শরীয়তের বিধি নিষেধ সম্বলিত সিলেবাস প্রণয়ন করার প্রস্তাব করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাকে আরবী, কুরআন ও ইসলাম এ তিনটি অংশে বিভক্ত সাধারণ পাঠ্যসূচীর প্রস্তাব দেন। তিনি আরবীকে বাধ্যতামুলক ভাষার মর্যাদা দেয়ার কথা বলেন। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ ও ঐচ্ছিক শিক্ষাসূচীর ক্ষেত্রে এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি তিনটি সুপারিশ পেশ করেন।

ক) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং কুরআনও সুন্নাতে ভাল দখল রাখেন এমন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে যাঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ব ও

তথ্যাবলীকে ইসলামী মতাদর্শের আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করে পেশ করতে সক্ষম।

খ) ইসলামী আইন, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে আরবী, ফারসী, উর্দূ, জার্মান, ইংরেজী ভাষায় যে সমস্ত বই আছে তা পর্যালোচনা করে যা হুবহু গ্রহণ করার মত তা গ্রহণ করা, যা রদবদল বা সংকলন করে কাজে লাগানো সম্ভব তা সেভাবে কাজে লাগানো।

গ) এ সকল বিষয়ে নতুন বই রচনা করার জন্য ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন লোক নিয়োজিত করা।

এ সুপারিশগুলো মুসলমানদের স্বীকৃত সকল ফিকাহও মাযহাবের লোকদের জন্য গ্রহণযোগ্য করা। তিনি বড় বড় মুসলিম পণ্ডিতদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ভাষণ দেয়ার জন্য মাঝে-মধ্যে দাওয়াত দেয়ার প্রস্তাব করেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কোন ভাষা নির্দিষ্ট না করে যে ভাষাই প্রয়োজন তাই গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

শিক্ষকদের আরবী ও ইংরেজী বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। মাওলানা এ প্রস্তাব পেশ করার পর মন্তব্য করেন যে, 'আমি দীর্ঘ কয়েক বছরব্যাপী চিন্তা-গবেষণার পর এ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত করা ছাড়া জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার আর কোন উপায় নেই। সেই সর্বাত্মক পরিবর্তন আমার এসব প্রস্তাব অনুসারে হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।'

দারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা

এভাবে মাওলানা মওদুদী তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি রূপরেখা জাতির সামনে পেশ করেন। তিনি এ সময়ে চিঠি-পত্রের মাধ্যমেও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ইসলামী আন্দোলনের পটভূমি তৈরীর দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ঐ সকল চিঠি-পত্রেও তিনি প্রচলিত শিক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করেন। ১৯৩৬ সালে চৌধুরী নিয়ায আলী খানকে লিখা এক পত্রে তিনি প্রচলিত শিক্ষার সমালোচনা করে লিখেন 'যে জিনিসের বিরাট অভাব রয়েছে তা হলো সঠিক ইসলামী প্রশিক্ষণ। আধুনিক শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলো তো ইংরেজদের স্বার্থেই তৈরী হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন মাদ্রাসাগুলো এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ"।

এ সময়ে (১৯৩৮ সালে) তিনি পাঠানকোটে দারুল ইসলাম গঠন করেন এবং ইসলামী সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে একদল লোক তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাছাড়া ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী দায়িত্বশীল লোক তৈরীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এখানে মাওলানা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী পন্ডিত ও খাঁটি মুসলমান তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

দারুল ইসলামে আগত লোকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। তাঁরা অবশ্যই ইংরেজী অথবা আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবেন এবং তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমানের হবে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আরবী জানেন তাঁরা প্রত্যেকে ইংরেজী শিক্ষিত লোককে আরবী ও ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। ইংরেজী শিক্ষিত লোক আরবী শিক্ষিত লোককে ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন। এভাবে তিনি দারুল ইসলামকে একটি ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

১৯৩১ সাল থেকে মাওলানা মওদুদী মাসিক তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় মুসলিম জাতির সত্যিকার ব্যাধি নির্ণয় করে তার সঠিক ব্যবস্থা-পত্র দান করতে থাকেন।

১৯৩৯ সালে তিনি লাহোর ইসলামীয়া কলেজে ইসলামিয়াতের অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনার কাজ করেন। সপ্তাহে তিন দিন মাওলানা ইসলামিয়াতের উপর জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ দিতেন। ফলে বহু সংখ্যক লোক ইসলামী জীবন-যাপন রীতি অবলম্বন করেন। মাওলানা এক বছর যাবত বিনা পারিশ্রমিকে ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও হিন্দুদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য ঐ সময়ে মুসলমানদের অস্তিত্বই শেষ করে দিতে পারে বলে মাওলানা স্পষ্ট বুঝতে পারেন। তাই মাওলানা শক্ত হাতে কলম ধরেন এবং "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধমালা লেখেন।

তিনি ভারতীয় একজাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এবং মুসলিম জাতিসত্তার পক্ষে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলনে জনমত গঠন করেন। ১৯৪১ সালে তরজমানুল কুরআনে মাওলানা, 'এক সালেহ জামায়াত কি জরুরত' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন এবং ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে পঁচাত্তর জন মর্দে মুমীন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। জামায়াতে ইসলামী ছিল মাওলানা মওদুদীর দীর্ঘ বাইশ বছরের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষন, গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার ফল। ১৯৫০ সালে জামায়াতে ইসলামীর জন্য তিন দফা দাওয়াত ও চার দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। চার দফা কর্মসূচীর মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগ, তানজিম ও তারবিয়াত, (সংগঠন ও প্রশিক্ষণ), ইসলাহে মোয়াশারাহ (সমাজ সংস্কার ও সংশোধন), ইসলাহে হুকুমত (রাষ্ট্র/সরকারের সংশোধন) অন্তর্ভূক্ত ছিল।

এ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ইসলামী আন্দোলনের কর্ম তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তৃতীয় দফা কর্মসূচীর সমাজ সংস্কার ও সংশোধনের মধ্যেই ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের মর্মকথা লুক্কায়িত। এ কর্মসূচীর আলোকেই জামায়াতে ইসলামী তার প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গঠন, ইসলামী শিক্ষার রূপরেখা জনগণের সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েই জামায়াত অগ্রসর হচ্ছে।

১৯৪৪ সালে দারুল ইসলাম পাঠানকোটের সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাতে সাতটা কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে অন্যতম তিনটি ছিল (১) গবেষণা কাজের জন্যে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন (২) আরবী ভাষায় কথোপকথনের অভ্যাস সৃষ্টি (৩) মৌলিক শিক্ষার জন্যে পাঠ্যসূচী তৈরী।

ছাত্র সমিতির অধিবেশনে ভাষণ

১৯৪১ সালের ৫ই জানুয়ারী মাওলানা মওদুদী দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা, লাখনৌর ছাত্র সমিতির অধিবেশনে ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা পেশ করেন ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষা সংস্কারের আমূল পরিবর্তনের নীতিমালাও পেশ করেন। শিক্ষা সংস্কারের জন্য তৎকালীন সময়ে যে

চিন্তা-ভাবনা চলছিল তাকে পুর্ণাংগ বিপ্লবী সংস্কারে রূপ দেয়া এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে একটা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন 'শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন লোক তৈরী করা যাঁরা দ্বীনে হকের মূলনীতি অনুযায়ী সঠিকভাবে দুনিয়ার নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে'। তৎকালীন সময়ে সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যাপারে মাওলানা বলেন, আজ পর্যন্ত যতগুলো সংস্কারমূলক পদক্ষেপ আমি দেখেছি তার সবই ভাল মানের অনুসারী তৈরী করার প্রস্তাব ও নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রস্তাব আজও আসেনি।

তিনি বিপ্লবী নেতৃত্ব তৈরীর জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের অপরিহার্যতা তুলে ধরেন। এ জন্য তিনি কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন।

১) খোদাবিমূখ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের উৎখাত করে খোদানুগত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

২) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে।

৩) আল্লাহর অবাধ্য নেতৃত্বের হাতে তৈরী শিক্ষা যা আসলেই ধর্মান্তরিত করারই ব্যবস্থা এমন শিক্ষার সাথে দ্বীনিয়াতের কিছু পাঠ্য বিষয় যুক্ত না করা।

৪) ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেজুড় জুড়ে দিয়ে সংস্কার সাধনের চিন্তা ভাবনা বাদ দেয়া।

তিনি একটি নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা ও তুলে ধরেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট হলো তাতে ধর্মীয় ও দুনিয়াবী শিক্ষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মুছে ফেলে উভয় শিক্ষাকে একক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত করা হবে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা ও শিক্ষার্থী উভয়ের সামনে একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে। আর তাহলো, 'আল্লাহর আনুগত্যের আদর্শকে দুনিয়ায় বিজয়ী ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম চালানো"। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে তিনি বলেন 'তাঁদের জ্ঞানগর্ভ ও চুলচেরা সমালোচনা সব অনৈসলামিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ভিতে ধ্বস নামিয়ে দেবে। তিনি তাঁর ভাষণে এ নয়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে তা চিহ্নিত করে তার সমাধানও নির্দেশ করেন।

শিক্ষার মান নির্ধারণ ঃ শিক্ষা কমিটি গঠন

মাওলানার এ বক্তব্য মুসলিম চিন্তাবিদদের নাড়া দেয়। এ ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মান নির্ণয়ের লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪৪ সালের ভারতের পাঠানকোটে কমিটি প্রথম বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন মাওলানা। ভাষণে তিনি পাঁচটি বিষয়ে শিক্ষার মান পেশ করেন। তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, আইনশাস্ত্র, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে ফ্যাকাল্টি খোলার প্রস্তাব করেন। তার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী অর্জনের কথা বলেন। তিনি বলেন 'মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আরবী ভাষা ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন, কুরআন অধ্যয়নের প্রস্তুতি, হাদীসের গবেষণামূলক অধ্যয়ন করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে'। প্রাথমিক শিক্ষার মান হিসেবে তিনি কতগুলো নৈতিক গুণ অর্জন এবং কিছু বিষয়ে ট্রেনিং দানের পরামর্শ দেন। জ্ঞানগত দিক থেকে মাতৃভাষা, প্রাথমিক আরবী, ফারসী, ইংরেজীর প্রাথমিক জ্ঞান, প্রাথমিক অংক শাস্ত্র, ভুগোল, ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস, ইসলামী আকীদা-আখলাকের ধারণা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ড্রয়িং শিক্ষা দেয়ার প্রস্তাব করেন।

১৯৪৪ সালে শিক্ষা কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈঠকে শিক্ষাকাল, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়।

শিক্ষা প্রচেষ্টা ঃ
পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। মাঝে একটি বৈরী রাষ্ট্রের অবস্থান দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি ভূখণ্ড মিলে একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের জন্ম একটি বিরল ঘটনাই বটে। পাকিস্তানের জন্মের এ অসাধারণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দু' ভুখন্ডের মানুষের একজাতিতত্বের ধারণা ও বিশ্বাস থেকে।

ভারত উপমহাদেশের দু' প্রান্তের দু'ভূখন্ড নিয়ে মুসলমানরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করল। উপমহাদেশে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার ফলেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের মূলে ছিল মুসলমানদের ঈমানী প্রেরণা। একমাত্র আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হয়েছিল। আজাদী পাগল মানুষেরা খুনের সাগর সাঁতরিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিল পাকিস্তান। সেদিন মুসলমানদের পূর্ণ অনুভূতি ছিল যে, তাদের ত্যাগ ও কুরবাণীতে অন্ততপক্ষে ইসলামের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে ইসলামের বাণী সমুন্নত হবে এবং পূর্ণাংগ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে ও সকল জুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটবে। সেখানে মানুষের প্রভুত্ব খতম হয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানের সকল কর্মকাণ্ডের উৎস হিসেবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' স্বীকৃতি পাবে। দেশের সংবিধানের ভিত্তি হবে আল-কুরআন।

অবশেষে ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটল। মুসলমানরা প্রত্যাশিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র লাভ করল। কিন্তু তাদের সকল আশা-নিরাশায় পরিণত হল। শিশু রাষ্ট্রে পাকিস্তানের পরিচালনার ভার যাঁদের ওপর অর্পিত হল তাঁরা জনগণের সকল আশা-আকাংক্ষাকে পদদলিত করল। কারণ তাঁদের ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা করার মত শিক্ষা-দীক্ষা, নৈতিকতা, ঈমান-আকিদা ও

চরিত্র ছিল না। বৃটিশ শ্বেত প্রভুদের স্থলে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রভু সেজে বসলেন শাসক শ্রেণী। তারা ভুলে গেলেন জাতিকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা।

পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ বৃটিশদেরই পদাংকানুসরণ করলেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রে যেভাবে ইসলামী আদর্শ উপেক্ষিত হল শিক্ষা ক্ষেত্রও তেমনি উপেক্ষিত হল। মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু সে দাবি পূরণ করা হল না। বৃটিশ আমলের পাশ্চাত্য-মানসিকতার গোলাম তৈরীর দ্বি-মুখী শিক্ষা ব্যবস্থাই অব্যাহত রাখা হল। তখনকার সময় ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার যদি শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের আলোকে পুনর্বিন্যাস করতেন তাহলে আজকের ইতিহাস নিশ্চয়ই ভিন্ন হত।

শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টা

পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রচলন না করে পকিস্তান আমলের বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করে এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সকল কমিশন ও কমিটির সুপারিশ যদিও কখনো পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি তথাপি তাদের সুপারিশসমূহ শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিস্তর ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো তৈরী, সিলেবাস-কারিকুলাম প্রস্তুত, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শ্রেণী বিন্যাসে সাহায্য করে।

আকরাম খান কমিটি

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার শিক্ষা সমস্যার সমাধান ও বৃটিশ প্রবর্তিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ মাওলানা আকরাম খানের নেতৃত্বে এ কমিটি গঠন করা হয়। সতের সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ১৯৫১ সালে রিপোর্ট পেশ করে। কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রশাসন ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে সুপারিশ পেশ করে।

আকরাম খান কমিশন প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষার পুঁথিকেন্দ্রীক ধারা পরিবর্তনেরও সুপারিশ করে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলিত কাঠামো

অপরিবর্তিত রেখে বাস্তব চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে নতুন বিষয় সংযোজন করার প্রস্তাব করে । এ সুপারিশমালায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শ ও জনগণের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিফলন হয়নি বলা যায়।

নিউ স্কীম মাদ্রাসা বন্ধ করা

শামসুল উলামা আবু নসর ওয়াহিদ বৃটিশ ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার ভিত্তিতে একটা নতুন শিক্ষা কাঠামো নির্মাণ করেন। সে কাঠামোকে নিউ স্কীম আখ্যা দেয়া হয়। এ কাঠামোর আওতায় ইংরেজী, আরবী, ধর্মীয় শিক্ষা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইংরেজীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এ স্কীম তৈরী করা হয়। মোটামুটি একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে তা গড়েও উঠেছিল। ১৯১৫ সাল থেকে নিউস্কীম মাদ্রাসা চালু করা হয়।

এ শিক্ষার মাধ্যমে যাঁরা শিক্ষিত হয়ে বের হয়ে আসছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই জীবন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁরা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং অনেকে প্রচুর খ্যাতিও কুড়িয়েছিলেন। এ শিক্ষা কাঠামোর মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বৈততা দূর করে একমুখী ও একক একটা কাঠামো নির্মাণ করাই লক্ষ্য ছিল। মাদ্রাসা শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার মাঝে সমন্বয় সাধন করা সহজ হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সরকার ১৯৫৫ সালে এ শিক্ষা পদ্ধতিকে বন্ধ করে দেয়। মাদ্রাসা সমূহে পুরাতন পদ্ধতি চালু করা হয় এবং ইংরেজী শিক্ষাকে বাদ দেয়া হয়। অধিকাংশ নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলোকে স্কুলে পরিণত করা হয়।

আতাউর রহমান খান কমিটি

১৯৫২ সাল থেকে পাকিস্তানের রাজনীতি ও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা লাভ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্বের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট অসম্পূর্ণ মনে করেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৯৫৭ সালে রিপোর্ট পেশ করে।

কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার

প্রস্তাব দেয়া হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করার সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড বিলুপ্ত করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠক্রম ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তে তিন বছর স্থায়ী ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়। তবে এ কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করার পূর্বেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে কমিটির চেয়ারম্যান আতাউর রহমান খান কমিটির বৈঠকে উদ্বোধনী বক্তব্যের এক পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে "অপচয়" বলে মন্তব্য করেন। তাঁর এ বক্তব্যের প্রতিবাদে অধ্যাপক গোলাম আযম 'ইসলামী শিক্ষার রূপরেখা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। দৈনিক আজাদ পত্রিকা তা প্রকাশিত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে জনাব আতাউর রহমান খানের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মাওলানা আকরাম খাঁকে চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক গোলাম আযমকে সেক্রেটারী করে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষা পূনর্গঠন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি যথেষ্ট পরিশ্রম করে সুপারিশমালা তৈরী করার সময়কালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রী সভা ভেঙ্গে যায়।

শরীফ কমিশনের রিপোর্ট

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর পাকিস্তানে আবার ক্ষমতার পালাবদল শুরু হয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হয়। ফিল্ড মার্শাল আইউব খান ক্ষমতায় আসেন। পূর্ববর্তী শিক্ষা সংস্কার কমিটি সমূহের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবি আবার ওঠে। এ দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালে এস. এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে ৫ সদস্যের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়।

কমিশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান 'প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন করে জাতীয় চাহিদা পূরণের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করতে' অনুরোধ করেন। কমিশন সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার প্রতিনিধি, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সর্বস্তরের

জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করে। ১৯৬০ সালে কমিশন সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে।

কমিশন পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সংহতির সাথে সম্পৃক্ত জাতীয় আদর্শ ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা এবং কর্ম-ভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তন করাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করে। শিক্ষাকে সার্বজনীন জাতীয় আশা আকাংক্ষার মূর্ত প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুপারিশ করে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব করে। নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ ও আধুনিক শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় সাধনের সুপারিশ, জাতীয় ভাষা উর্দূ এবং বাংলার দুর্বলতা দূর করা এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে চালুর সুপারিশ করে। কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলেও পুরো সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

বিচারপতি হামিদুর রহমান কমিশন

শরীফ কমিশনের রিপোর্ট পূর্ণ বাস্তবায়ন না করেই তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বিচারপতি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালে আরো একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এ কমিশন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ সাধনের জন্য সুপারিশ পেশ করে।

ইসলামিক এরাবিক ইউনিভার্সিটি কমিশন

সারাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতির দাবিতে মাদ্রাসা ছাত্রদের ব্যাপক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এস. এম হোসাইনকে চেয়ারম্যান করে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কমিটি গঠন করে। মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন ও মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করাই ছিল এর উদ্দেশ্যে। এ লক্ষ্যে সুপারিশ করার জন্য কমিটিকে নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামিয়াত বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ সুপারিশ মালা বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়

ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করার যথাযথ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেয়া হয়।

এ সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমদের উদ্যোগে 'ইসলামিক আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি" গঠন করা হয়। সর্বস্তরের আলেমদের নিয়ে গঠিত এ কমিটির পক্ষ থেকে একটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়। সুপারিশমালায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার পূর্ণাংগ রূপরেখা তুলে ধরা হয়। বাস্তবায়ন কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আবদুর রহীম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের নিকট সুপারিশমালা পেশ করেন।

সুপারিশমালায় প্রস্তাব করা হয়–

১) কমিটি প্রণীত রিপোর্ট পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা

২) সুপারিশমালার ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য একটা বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা

৩) সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করার পূর্বে আইন পরিষদ ও জাতির সামনে পেশ করা

৪) প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেয়ার জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সরকারের নিকট আবেদন করা

৫) যথাযথ কার্যকরী উদ্যোগ ও আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অভিজ্ঞ কমিটি দ্বারা প্রকল্প তৈরী করা

৬) ১৯৬৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় সনদের ভিত্তিতে যাবতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা

কমিটি ১৯৬৪ সালে এ নির্দেশিকা ও লক্ষ্যমাত্রার আলোকে রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু সে রিপোর্টের সুপারিশমালাও বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

নূর খান শিক্ষা কমিশন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে এবং যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করা সম্ভব হয়নি। তখন পর্যন্ত ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু ছিল। সে সময় পর্যন্ত অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন ও গঠিত হয়। তাদের

সুপারিশের ভিত্তিতে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করা হয়নি।

জাতীয় আশা-আকাংক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য ১৯৬৯ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে 'নতুন শিক্ষানীতি' নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৯৭০ সালে রিপোর্ট পেশ করে। কমিটি তৎকালীন সময়ে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি চিহ্নিত করে জাতীয় সংহতি ও জাতীয় ঐক্যের খাতিরে মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করার এবং ইসলামিয়াত বিষয় দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামুলক করার প্রস্তাব করে।

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি খসড়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ খসড়া শিক্ষানীতির উপর (নিপায়) আলোচনা সভার আয়োজন করে। সমাজতন্ত্রী ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী মহল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর এবং প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাতিল করার প্রস্তাব করে। তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা মহানগরী সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবদুল মালেক ইসলামী শিক্ষার পক্ষে ক্ষুরধার যুক্তি ও বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। শ্রোতারা ইসলামী শিক্ষার পক্ষেই মত প্রকাশ করে।

ডাকসুর উদ্যোগে পুনরায় আলোচনা সভা ডাকা হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির পক্ষে প্রস্তাব পাস করার ষড়যন্ত্র করা হয়। এ সভায় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য সুযোগ দাবী করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষের ছাত্রদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আবদুল মালেকের উপর আক্রমণ করা হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। ১৯৬৯ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি শাহাদাত বরণ করেন– 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। তিনিই ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

১৯৭০ সালে নূর খান কমিটি রিপোর্ট পেশ করার পর তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রভৃতি কারণে সে রিপোর্ট আর বাস্তবায়ন করা হয়নি।

কলকাতা থেকে ঢাকায় মাদ্রাসা স্থানান্তর

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের

অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি পায়। দেশ বিভাগের সময় গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালতও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাগ বন্টন করা হয়। শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটি আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত দেয়। মাদ্রাসার তৎকালিন প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর জিয়াউল হকের প্রাণান্তকর চেষ্টায় ঢাকায় আলিয়া মাদ্রাসা স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরবী বিভাগ ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং এংলো পার্শিয়ান বিভাগ কলকাতাতেই থেকে যায়। ঢাকায় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান কবি নজরুল সরকারী কলেজ) প্রথমে অস্থায়ী ভাবে মাদ্রাসার ক্লাশ শুরু হয়। মাদ্রাসা স্থানান্তরের সাথে সাথে ছাত্র-শিক্ষক সবাই এখানে চলে আসেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৭-১৯৭১

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী চাইলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নতির পথে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারতেন। পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এর নেতৃবৃন্দ ইসলামী সমাজ কায়েম, ন্যায় বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেননি। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে পরিবর্তন আনা দরকার ছিল তা করা হয়নি।

পাকিস্তানের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার সমন্বিত উন্নয়নের পরিবর্তে বাস্তব ক্ষেত্রে বস্তুগত ভোগ-বিলাসী মানসিকতা প্রাধান্য পেল। পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিশন যদিও ঘোষণা দিয়েছিল যে, আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা হবে। বৃটিশ শাসনামলেও আরবী ভাষা আবশ্যিক হিসেবে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সিলেবাসভুক্ত ছিল। অথচ পাকিস্তান আমলে জাতীয় শিক্ষানীতিতে সে আরবী ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়। ফলে অনেক স্কুলে আরবী শিক্ষকের পদ বিলুপ্ত হয়।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও নতুন শিক্ষানীতি নির্ধারণ কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র অক্ষুন্ন রেখে এ শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বেশ

কিছু সুপারিশ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগও নিয়েছিলেন। নতুন শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা এবং সাধারণ শিক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুযায়ী ইসলামই জাতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি, উন্নতির সোপান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের উৎস– এসব বিষয় শিক্ষা দানের জন্য পাঠক্রম ও পুনর্বিন্যস্ত করার সুপারিশ করা হয়েছিল।

উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলার সুপারিশ করা হয়েছিল। এ বিভাগের ছাত্ররা শুধু ইসলামই শিক্ষা করবেনা তাঁরা যেন প্রতিযোগিতায় বিশ্বে সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলাও করতে পারে সে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এ লক্ষ্যে কয়েকটি নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী, গবেষণা ও প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য পূর্ণাংঙ্গ ইসলামিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করা হয়েছিল।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য,যে পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে কোন কর্তৃপক্ষই এ মহৎ উদ্যোগ ও সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করেনি। সরকারী মাদ্রাসার সংখ্যাও বৃদ্ধি করেনি। মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়নি। পাকিস্তান আমলে নতুন করে যে তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাতেও ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রস্তাবিত ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নেয়া হয়নি। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফোরকানিয়া, হাফেজিয়া, কাওমী ও দারসে নিজামী মাদ্রাসার উন্নয়নেও কোন ভূমিকা রাখা হয়নি।

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েই নেতারা ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ভুলে যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাঁচ মাস পর জামায়াতে ইসলামী সর্বপ্রথম ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানায়। জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মওদূদী (রঃ) ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোর আইন কলেজে বক্তৃতা কালে এ দাবী উত্থাপন করেন এবং দাবী মেনে নেয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীগণ আন্দোলন শুরু করেন। তিন মাসের মধ্যে আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে।

১৯৪৯ সালে আন্দোলনের চাপে পাকিস্তান গণ পরিষদ ঐতিহাসিক "আদর্শ প্রস্তাব" পাশ করে। ১৯৫১ সালের ২১শে জানুয়ারি পাকিস্তানের একত্রিশ জন প্রসিদ্ধ আলেম করাচীতে সমবেত হন এবং সর্বসম্মতিক্রমে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ২২ দফা মুলনীতি পেশ করেন। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র বাস্তবায়ন আন্দোলনের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর দাবী ও উত্থাপিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মওদুদী (রঃ) পাকিস্তান ইসলামী জমিয়তে তালাবার বার্ষিক সম্মেলনে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিও এর মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন এবং পাকিস্তানের উপযোগী একটা শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামো সম্মেলনে পেশ করেন।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা

বলা বাহুল্য তখনও দেশে দু' ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। এক, প্রাচীন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা। দুই, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু শিক্ষা ব্যবস্থা।

তিনি উভয় প্রকার শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'মাদ্রাসা শিক্ষা' ব্যবস্থা আমাদের কিছু কিছু ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করে। এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মসজিদের ইমামতি, মাদ্রাসার শিক্ষকতাই একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দিতে পারছেনা। এটা পুরোপুরি ধর্মীয় শিক্ষাও নয়। এতে ধর্মীয় শিক্ষার উপাদান নিতান্তই কম। এর পাঠ্যসূচীতে পুরো কুরআন মজীদ অন্তর্ভূক্ত নেই। কয়েকটি সূরা মাত্র পড়ানো হয়। গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতেও পুরো কুরআন মজীদ পড়ানো হয়না। হাদীসের অবস্থাও তাই। ফিকাহ ও আকীদার সাথে সম্পৃক্ত হাদীসগুলোর উপরই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। যে সব হাদীসে দ্বীনের তাৎপর্য বুঝা যায়, ইসলামের অর্থনেতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা নৈতিক বিধান বর্ণিত হয়েছে, শাসন তান্ত্রিক বিষয়, বিচার ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে সে সব হাদীসের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়না। হাদীস-কুরআনের তুলনায় ফিকাহ শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকা হয়'। সুতরাং যে ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে সে লক্ষ্য অর্জনেও তা যথেষ্ট নয়।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বৃটিশ প্রবর্তিত। এ শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'মুসলমানদের কৃষ্টি- কালচারকে বাঁচিয়ে রাখা ও তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৃটিশ এ শিক্ষা চালু করেনি, এমনকি একটা স্বাধীন দেশ চালানোর উপযোগী লোক তৈরীও তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা এমন একটা গোষ্ঠী তৈরী করতে চেয়েছে যারা তাদেরকে সরকার চালাতে সাহায্য করতে পারে, যারা তাদের ভাষা জানে, যাদের সাথে তারা যোগাযোগ করতে পারে ও যেমন খুশী কাজ করতে পারে। এটা খোদাহীন শিক্ষা-ব্যবস্থা, এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম সম্পর্কে জানার কোন সুযোগ নেই। এতে চরিত্র ও নৈতিকতা তৈরীর ব্যবস্থা নেই। এ শিক্ষা পাশ্চাত্য জাতিগুলোর যাবতীয় খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোই ছড়াচ্ছে। এর দ্বারা স্বাধীন দেশের উপযোগী দৃঢ় চরিত্রের লোক তৈরী সম্ভব নয়।

আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার লেজুড় জুড়ে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের চেষ্টা করাকে তিনি বেওকুফী বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি শিক্ষার সামগ্রিক পরিবর্তন সাধনের সাথে সাথে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধাবণ,দ্বীন দুনিয়ার পার্থক্য দূর করা এবং চরিত্র গঠনকে পুঁথিগত বিদ্যার

উপর প্রাধান্য দেয়ার কথা বলেন।

তিনি পাকিস্তানের উপযোগী একটা শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ-রেখা পেশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস, কারিকুলাম এবং কাঠামোও তিনি তুলে ধরেন।

মাওলানা মওদুদী (রঃ) তদানীন্তন পাকিস্তান শিক্ষা কমিশনকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে তিনি শিক্ষার সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা করেন, পরামর্শ দেন এবং একটি পূর্ণাংগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা পেশ করেন।

১৯৬০ সালে শাহ সউদ মদীনা শরীফে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মাওলানা মওদুদী (রঃ)কে শাহী মেহমান হিসেবে বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি সেখানে ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খসড়া রূপরেখা পেশ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে যৎসামান্য রদবদলের পর মাওলানার রূপরেখা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং একে ভিত্তি করেই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মাওলানা মওদুদী (রঃ) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির স্থায়ী সদস্য মনোনীত হন।

ইসলামিক এরাবিক বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অনুসরণীয় ভূমিকা পালন করেছিল তার মূলে মাদ্রাসা শিক্ষার অবদানই ছিল বেশী। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে ইসলামকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে এটা ছিল তার জ্বলন্ত প্রমাণ। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে মাদ্রাসা শিক্ষা, ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তার দাবীই ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল পরিবর্তন, যাতে পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একটি উচ্চ গবেষণা প্রতিষ্ঠান কায়েমের মাধ্যমেই তা অর্জন করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য জমিয়াতুল মুদার্রেসীন পূর্ব পাকিস্তান শাখা ১৯৬২ সালে লালবাগ মসজিদে নেতৃস্থানীয়

আলেম-উলামাদের এক সম্মেলন আহবান করে। এ সম্মেলনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি ইসলামিক এরাবিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার জন্য জেনারেল ওরগানাইজিং কমিটি গঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরিপূর্ণ প্রকল্প তৈরীর জন্য স্পেশাল প্লানিং কমিটি গঠন করা হয়। জেনারেল ওরগানাইজিং কমিটির (The General Organising Committee) সেক্রেটারী নির্বাচিত হন মাওলানা আবদুর রহীম। স্পেশাল প্লানিং কমিটির (Special Planning Committee) সদস্য নিযুক্ত হন মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, অধ্যাপক গোলাম আযম, আজিজুল হক, আলাউদ্দিন আল আজহারী, খুররম জাহ মুরাদ, আজিজুর রহমান ও আবদুল আহাদ কাশেমী।

প্লানিং কমিটি অনেকগুলো বৈঠক করে এবং মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মাওলানা আতহার আলী বৈঠকে তাঁদের প্রতিনিধিদের প্রেরণ করেন। কমিটি ১৮ই অক্টোবর রিপোর্ট চূড়ান্ত করেন। কমিটি মঞ্জুরী ক্ষমতা সম্পন্ন, আবাসিক শিক্ষায়তন সহ 'পূর্ব পাকিস্তান ইসলামিক এরাবিক ইউনিভার্সিটি' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থাপনের সুপারিশ করে। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কারিকুলাম, সিলেবাস, ডিপার্টমেন্ট, ফেকাল্টি, আয় ব্যয় সহ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে পূর্ণাংগ সুপারিশমালা পেশ করে। কমিটির প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের নিকটও পেশ করা হয়।

কমিটি গঠন, সুপারিশমালা তৈরী এবং তা সরকারের নিকট পেশ করার ক্ষেত্রে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত নেতৃবৃন্দের ভূমিকাই ছিল মুখ্য।

ছাত্রদের মাঝে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৪৭ সালে। এ বছরেই নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে তালাবাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সংগঠন ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদেরকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করে। আগামী দিনের নাগরিক ও নেতৃবৃন্দকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাঁদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণ জ্ঞান দানের মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে জমিয়তে তালাবার এ আন্দোলকে শিক্ষা আন্দোলন বা পাকিস্তানের আদর্শিক পুনর্গঠন আন্দোলনও বলা যেতে পারে।

ছাত্রদের মাঝে ইসলামের ব্যাপক প্রচার, জ্ঞান বিতরণ, ইসলামী আদর্শের অনুশীলনে আগ্রহী ছাত্রদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনে ইসলামী জমিয়তে তালাবা ভূমিকা পালন করে। জমিয়তে তালাবার শিক্ষা আন্দোলনের বৈশিষ্টই হলো, শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনে নিয়মতান্ত্রিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা।

পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী ছাত্র-সংঘ তৎকালীন পাকিস্তানের উভয় অংশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সংঘ কর্মীদের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিচিত করার জন্য বই ও পুস্তিকা প্রকাশ করে। জাতীয় আদর্শ, আকাংখা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের বাস্তবপন্থা নির্দেশ করে কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি দেয়। শিক্ষার সংকট দূরীকরণ ও শিক্ষা পুনর্গঠনের ব্যাপারে ছাত্র ও জনমত সৃষ্টির জন্য শিক্ষা সপ্তাহ পালন করে। ছাত্র-সুধী সমাবেশ, ছাত্র-জনসংযোগ ও সংঘের প্রস্তাবিত শিক্ষা সংস্কারের সপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করে এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সদস্যদের নিকট স্মারকলিপি পেশ করে।

তাঁরা শিক্ষামন্ত্রী নূর খান ও পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভাইস চ্যান্সেলরদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সাথে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

১৯৬৯ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে 'নতুন শিক্ষানীতি নির্ধারণ কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটি পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এক নতুন প্রস্তাব পেশ করে এবং জনমত যাচাই ও প্রস্তাবের সংশোধন ও সংযোজনের জন্য জনসমক্ষে তা প্রকাশ করে। নয়া শিক্ষানীতি ঘোষণার সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র-সংঘ প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি যথাযথ পর্যালোচনার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করে। সাব কমিটি শিক্ষানীতির খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে তা কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরে প্রেরণ করে এবং "প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে ইসলামী ছাত্র-সংঘের ভাষ্য" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।

বাংলাদেশে শিক্ষা সংস্কার
১৯৭১-১৯৯৮

পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসক গোষ্ঠির অন্যায় আচরণ এবং বৈষম্যপূর্ণ নীতির কারনে পুর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে। সরকার এ অসন্তোষ নিরসনে আন্তরিক না হয়ে আশ্রয় নেয় জুলুম এবং নির্যাতনের। এতে জনগন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। আর এ বিক্ষোভ এক পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ লাভ করে। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

আওয়ামী লীগ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠন করে প্রথমেই দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করার কাজে হাত দেয়। প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মুলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করে তারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনায় চরম আঘাত হানে। ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। তাছাড়া দেশের সবকটি রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে কায়েম করা হয় বাকশাল।

তাদের ইসলাম নির্মূলের প্রথম টার্গেট ঠিক করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও হলের নাম পরিবর্তন করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে ইকরা বা 'পড়' শব্দটি মুছে ফেলার মাধ্যমে। সরকারের ইসলাম বিদ্বেষের আর একটি নমুনা হচ্ছে ব্যক্তি নজরুল ইসলামের নামকে খণ্ডিত করে ইসলাম শব্দটি বাদ দিয়ে কবি নজরুল ইসলাম কলেজের নামকরণ করা হয় কবি নজরুল কলেজ। এভাবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে সলিমুল্লাহ হল এবং জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করা হয়।

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনসত্তা নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান করে নেয়। জাতিকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেশের বিপুল জনসমষ্টিকে জন সম্পদে পরিণত করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থ্যার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সরকার ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের সমন্বয়ে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক আদেশে কমিশন গঠিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ সালে এ কমিশন উদ্বোধন করেন। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে শিক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে কমিশনের সদস্যগণ ভারত সফর করেন এবং সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

কমিশন জনমত যাচাইয়ের জন্য একটি প্রশ্নমালা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নানাবিধ সংস্থা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করে। কমিটি সরকারী প্রস্তাবের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে ১৯৭৩ সালের ৮ ই জুন অর্ন্তবর্তীকালীন এবং ৩০শে জুন, ১৯৭৪ তারিখে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে।

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পর্যালোচনা

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার মাধ্যমে রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরপরই এটি বিতর্কিত হয়ে পড়ে। কমিশনের সুপারিশমালায় কিছু সুপারিশ ছিল কল্যাণধর্মী ও যুগোপযোগী, যা শিক্ষানীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করেছে। আবার সুপারিশমালার এমন কিছু মৌলিক দিক ও বিষয় ছিল যা ছিল দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা- আকাঙ্খার বিপরীত এবং জনগণের চিন্তা-চেতনা, ঐতিহ্য ,মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক জীবনবোধের বিরোধী।

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষার সর্বস্তরে তৎকালীন সময়ের সাংবিধানিকভাবে চাপিয়ে দেয়া রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও

ধর্মনিরপেক্ষতা-এর প্রতিফলন ঘটানো হয়। এতে বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, প্রাথমিক স্তর থেকে বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা ও নবম শ্রেণী থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হয়। সর্বস্তরে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রসারের সুপারিশ করা হয়। ১৯৮০ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের অবসান ও শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালা সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলার ভাবধারা গড়ে তোলার জন্যই মূলত রচিত হয়েছিল। শিক্ষা কমিশন 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার'কে, শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বিবর্জিত সেক্যুলার চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি ও তার আলোকে ব্যবহারিক জীবন গড়ে তোলার উপর কমিশন গুরুত্ব প্রদান করে এবং ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য রূপরেখা প্রণয়ন করে। এ লক্ষ্যে সেক্যুলার ভাবধারায় উজ্জীবিত শিক্ষক নিয়োগ, প্রাক-প্রাথমিক স্তরকে ধর্মের প্রভাবমুক্তকরণ এবং প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এক ও অভিন্ন ধরনের শিক্ষার সুপারিশ করে, যাতে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করার কথা বলা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কোন ধর্ম শিক্ষা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেও ধর্ম শিক্ষা নেয়ার কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে কমিশনের সুপারিশ ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। কমিশন প্রথম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের সুপারিশ করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিলুপ্ত করার পাঁয়তারা করে। সাধারণ শিক্ষার মত মাদ্রাসায়ও প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সপ্তাহে ইসলাম শিক্ষার জন্য মাত্র দু'টি পিরিয়ড রাখা হয়। এবতেদায়ী শিক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলিত ধারা কে ধ্বংস করে একে হিন্দু ও বৌদ্ধদের টোল শিক্ষার সমপর্যায়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে তা ছিল একটি ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, যাতে জনগণের মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ঈমান- আকীদা- বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। অবশেষে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সর্বশেষ৭৫এর পটপরিবর্তনের কারণে সর্বনাশা এ শিক্ষানীতি তখন বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

ক্ষমতার পট পরিবর্তন

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবারবর্গ সহ মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্রবাদী ও ভারতঘেঁষা শাসনের অবসান ঘটে। দেশের রাজনীতিতে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তিতে পরিবর্তন আনা হয়। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে সকল কর্মের উৎস হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হয়। শাসনতন্ত্রের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সংযোজন করা হয়। ইসলামী সংগঠন ও দল গড়ার বিধি- নিষেধ শাসনতন্ত্র থেকে বিলোপ করা হয়। একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার যে বিধান ছিল তা উচ্ছেদ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি

জিয়ার শাসনামলে শিক্ষা সংস্কার ও সংশোধনের জন্য ১৯৭৬ সালে সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির উদ্বোধন করা হয় ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৬ সালে এবং কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬ সালে। কমিটি ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষা, সাহিত্য, পরিবেশ- পরিচিতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যভুক্ত করে। বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচীতে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিজ্ঞান শিক্ষাকে স্থান দেয়। মাদ্রাসা শিক্ষায় সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে।

অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি

১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে 'শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ' গঠিত হয়। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রতিনিধি ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ৪০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। পরিপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণয়ন সময় সাপেক্ষ বিবেচনায় পরিষদ অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি তৈরী করে। এতে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বেতন কাঠামো তৈরী ও শিক্ষকদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পদক ও পুরস্কার দানের সুপারিশ করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খান রিপোর্ট

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে লেফটেনেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন এবং দেশে সামরিক আইন জারি করেন। লেফটেনেন্ট জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করেন। 'মজিদ খান কমিটি' শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনার উপর রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ তুলে ধরা হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করে। এতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৮৭

এরশাদ সরকারের শাসনামলে ১৯৮৭ সালের ২৩ শে এপ্রিল অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্যের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন পেশাজীবি ও রাজনীতিবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করে। কমিশনের দু'টি কমিটি জাপান, চীন ও থাইল্যান্ড সফর করে সে সকল দেশের শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হাসিল করে। ১৯৮৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি কমিশন চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে দেশের শিক্ষা সংস্কার, পুনর্বিন্যাস এবং উন্নয়নের

দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। কমিটি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। শিক্ষার বিরাজমান সমস্যা ও সংকট চিহ্নিত করে। রিপোর্টে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়।

শিক্ষা প্রচেষ্টা ১৯৯১-৯৫ পর্যন্ত

১৯৯০ সালে গণ আন্দোলনে এরশাদ সরকারের পতন হয়। '৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি বিজয় লাভ করে এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। এ সময় বিএনপি সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার-সংশোধনের মৌলিক কোন কাজে হাত দেয়নি এবং কোন শিক্ষা কমিটি বা কমিশন গঠন করা হয়নি। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। দেশের সকল কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পণ করে।

তাছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনও প্রবর্তন করে। এ আইনের আওতায় বেসরকারী উদ্যোগে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ যাবত আঠারটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মাঝে দুটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে, যথা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ও দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিএনপি সরকারের আমলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যক্রমে হাত দেয়া হয়। পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার কাজে সেক্যুলার ও বামপন্থী শিক্ষক ও লেখকদের নিয়োজিত করা হয়। পাঠ্যপুস্তক সমূহে ইসলামী ভাব সম্পন্ন লেখা কমানো হয়। সেক্যুলার চিন্তা ও ভাবধারার আলোকে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি- ১৯৯৭

১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজে হাত দেয়। প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। ১৯৭২ সালে প্রণীত 'ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশন' রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বর্তমান সময় ও যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নীতিমালা ঠিক করে দেয়া হয়।

সরকারের এ নীতিমালা 'ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে'র ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নতুন করে শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করলেও বিতর্কিত 'কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে'র ভিত্তিতে, শিক্ষানীতি প্রণয়নের সীমা নির্ধারিত করে দেয়ার কারণে এ প্রতিবাদ তীব্র আকার ধারণ করে। দেশের শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, আলেম-ওলামা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-শিক্ষক, সংগঠন-সংস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলো এর প্রতিবাদ করে।

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ, সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা এবং বিবৃতির মাধ্যমে সরকারী নীতির সমালোচনা করা হয় এবং জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবী পেশ করা হয়। ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি জাতীয় আদর্শ ইসলামের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন, সংশোধন ও সংস্কারের দাবীতে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হককে স্মারকলিপি প্রদান করে। সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ সহ দেশের বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থাও অনুরূপ স্মারকলিপি দেয়।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বর্তমান কমিশন ব্যাপকভাবে জনমত আহবান না করে এবং প্রদত্ত স্মারকলিপি ও সুপারিশমালার প্রতি কোন শ্রদ্ধা না দেখিয়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরী করে সরকারের নিকট পেশ করেছে।

পর্যালোচনাঃ প্রতিবেদন ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭

প্রফেসর এম. শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৬ সদস্যের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সরকারের নিকট যে প্রতিবেদন পেশ করেছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

প্রসংগ কথায় জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব এম, শামসুল হক শিক্ষানীতির প্রত্যাশা প্রসংগে বলেন, "জনগনের আশা-আকাঙ্খা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হবে এটাই প্রত্যাশিত"। দেশের জন্য

উপযোগী ও কল্যাণকর শিক্ষার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের প্রয়োজন নিরক্ষরতা মুক্ত একটি শিক্ষিত, প্রগতিশীল, বিজ্ঞান-মনস্ক, দেশপ্রেমিক, নৈতিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা, যারা এদেশ গঠনে যথার্থ অবদান রাখতে পারবে"। কিন্তু কমিটি প্রণীত শিক্ষা রিপোর্টে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের প্রতিপালন কম হয়েছে, বিশেষ করে এদেশের অধিকাংশ জন গোষ্ঠীর আদর্শ ইসলাম, ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন রিপোর্টে প্রকাশ পায়নি।

প্রতিবেদনে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭- অধ্যায় ৩ এর ভূমিকায় প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে যে "ভৌত সুযোগ সুবিধার গুরুতর অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা এবং প্রাথমিক স্তরে বিভিন্নমুখী শিক্ষার ধারা প্রভৃতি কারণে বর্তমানে সাধারণ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। সাম্প্রতিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তাতে শিক্ষার পরিমানগত বিস্তার ঘটলেও দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সে সব যথেষ্ট কার্যকর হয় নি"। কমিটি এ বক্তব্যের আলোকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করতে পারেনি।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (অধ্যায়-৩) বর্ণনা করতে গিয়ে কমিটি বলেছে যে, "প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তীকালের জীবনভর শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করে। কাজেই এই স্তরের শিক্ষা, যাকে আজকাল মৌলিক শিক্ষা বা বুনিয়াদি শিক্ষা বলে গন্য করা হয় তা প্রতিটি শিশুর আনন্দময় বর্তমান ও উৎপাদনশীল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে অনেককে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কর্মজীবন আরম্ভ করতে হয়, আবার অনেকে পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করে। এই দুই ধরনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার"।

কমিটি উল্লেখিত বক্তব্যের (দাগ দেয়া) দ্বারা আমাদের শিশুদের বস্তুবাদী আদর্শ ও ভোগবাদী চিন্তা-চেতনার অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কমিটি শিশু মনে নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক আচরণের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও শিশুর মননশীলতার উপযোগী করে চরিত্র গঠনে ও

আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির কোন প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করেনি।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার "প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী শিরোনামে ৫.১ বলা হয়েছে" প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম হবে দেশের আর্থ সামাজিক চাহিদা, শিশুদের দেহমনের পুষ্টি এবং তাদের সংস্কৃতি চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন"। এতে সাংস্কৃতিক চেতনা বলতে কমিটি কি বুঝাতে চেয়েছে বিষয়টি অস্পষ্ট রয়েছে। প্রকারান্তরে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে বলে মাদ্রাসা শিক্ষার ভিতকে ধ্বংস করে দেয়ার পাঁয়তারা করা হয়েছে।

উল্লেখিত শিরোনামের তৃতীয় লাইনে বলা হয়েছে যে, "প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ ও বিজ্ঞান। এ ছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়। তৃতীয় শ্রেণী থেকে থাকবে ইংরেজী ভাষা এবং ধর্ম (জীবনাচরণ ও নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্বসহ)"। এতে বুঝা যায় যে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিষয় থেকে আরবী ও ইসলাম শিক্ষা বাদ দেয়া হয়েছে। উপরন্তু চারু ও কারুকলা এবং সংগীত যোগ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমান ব্যবস্থায়ও যেখানে শিশু কিশোরদের জন্য ১ম শ্রেনী থেকে ইসলামী শিক্ষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেখানে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে ৩য় শ্রেনীর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত রাখার সুপারিশ করেনি। অথচ বর্তমানেও ১ম শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত ৪টি বিষয় শিশুদের পাঠ্যসুচীর অন্তর্ভূক্ত, যথা- (১) বাংলা (২) অংক (৩) ইংরেজী (৪) ইসলাম শিক্ষা। মূলত আরবীকে একেবারে বাদ দিয়ে চারু ও কারুকলা এবং সংগীত শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করে শিশুমনে ধর্মহীন চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় আচার-আচরনে বিরূপ মানসিকতা সৃষ্টিরই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

কমিটির রিপোর্ট, অধ্যায় ১- সার সংক্ষেপ এ "প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা" শিরোনামের চতুর্থ লাইন থেকে বলা হয়েছে- "প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ এবং

শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতুহল, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুণাবলী অর্জন করতে সহায়তা করা হয়"। ...কমিটির উপরোক্ত বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের খালেক আল্লাহ্‌কে জানার বিষয়টি কাংক্ষিত গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কমিটির রিপোর্ট, অধ্যায়-১- সারসংক্ষেপ এর ৮ নং সুপারিশে বলা হয়েছে "শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে নিম্ন প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচ এস সি পাশ মহিলা"। কমিটির বক্তব্যে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ায় দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবকের বেকারত্বের সংখ্যাকে আরও বৃদ্ধি করবে। অন্যদিকে এ সুপারিশ দ্বারা মাদ্রাসাতেও মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি এসে যায় যা যুক্তিযুক্ত নয়।

অধ্যায়-৪ গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শিরোনামের ভূমিকায় কমিটি বলেছে "জনগনের দ্বারে স্বাধীনতার সুফল পৌছাচ্ছেনা। তাই দেশে বিরাজমান ভয়াবহ নিরক্ষরতা দূর করার জন্য গণশিক্ষা অর্থাৎ একাধারে বয়স্ক শিক্ষা এবং যে সব শিশু-কিশোর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন অপরিহার্য"। এটুকু বলেই কমিটি এনজিও পরিচালিত শিক্ষা পদ্ধতিকে উৎসাহিত করেছে বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব তদারকি ভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবং সমজিদ ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র ও আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব সহজতর পন্থা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মত যা দেশের মানুষের কাছে সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্যও বটে। কিন্তু কমিটির সুপারিশে মসজিদ বা আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তবের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপারিশে "ইসলামী শিক্ষা" রাখা হয়নি।

কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত "জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে"র অধ্যায়– ৭ "মাদ্রাসা শিক্ষা- বিষয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত ইবতেদায়ী পাঁচ বছর, দাখিল পাঁচ বছর, আলিম দুই বছর, ফাজিল দুই বছর ও

কামিল দুই বছরের পরিবর্তে ইবতেদায়ী আট বছর, দাখিল দুই বছর, আলিম দুই বছর, ফাজিল তিন বছর/চার বছর, কামিল দুই/এক বছর মেয়াদী করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা করা হয়েছে। আরবী ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের পরিবর্তে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

মাদ্রাসা বোর্ডকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব করা হলেও বোর্ড সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন সুপারিশ করা হয়নি।

মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি শাখা খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। বরং প্রয়োজন ছিল পূর্ণাংগ বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাব করা যা করা হয়নি।

এ ক্ষেত্রে সাধারণ বিষয়গুলোর উপর যে ভাবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতে মাদ্রাসায় দ্বীনি শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিল তা ব্যাহত হবে।

কমিটির রিপোর্ট, অধ্যায় -১, সারসংক্ষেপ এর ১ নং সুপারিশে বলা হয়েছে "সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে" । ২ নং সুপারিশে বলা হয়েছে- "মাধ্যমিক স্তরে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড"। "মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের"। বলা যায় যে, শুধুমাত্র বিশেষ পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে দিলে মাদ্রাসা শিক্ষার দ্বীনি ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র ধারা বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা শিরোনামে কমিটির রিপোর্ট, অধ্যায় -১, সারসংক্ষেপ এর ১১ নং সুপারিশে বলা হয়েছে " সরকারের নির্ধারিত হারের চেয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান বেশী হারে বেতন আদায় করে, যারা চাঁদা আদায় করে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং মিশনারী, ট্রাষ্ট ও দেশী-বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সে সব প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বরাদ্দ দেয়া চলবেনা। তবে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও অন্যান্য

নীতিমালা বাধ্যতামূলক ভাবে অনুসরন করতে হবে। সরকারের অনুমতিক্রমে কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও-লেবেল, এ- লেবেল চালু রাখতে পারবে"। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তা ছাড়া বেসরকারী উদ্দেশ্যে বা ট্রাষ্ট/ সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে যা শিক্ষা সম্প্রসারনের পথকে রুদ্ধ করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত শিরোনামের সুপারিশ ১০ এর শেষে বলা হয়েছে "মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপন করা হবে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে মানের সমতা নির্ণয়ের দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের"। কমিটির উপরোক্ত বক্তব্য থেকে দেখা যায় যেখানে ফাজিল ও কামিল স্তরে আধুনিক বিষয়টি সংযোজনের পর ফাজিলকে বি, এ,র মান প্রদান মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রাণের দাবী। তাছাড়া ফাজিল ও কামিলকে যেখানে একটি এফিলিয়েটেড (মঞ্জুরী ক্ষমতাসম্পন্ন) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার নিয়ন্ত্রনে পরিচালনার গণদাবী রয়েছে, সেক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির উল্লেখিত বক্তব্য হাস্যকর বললে অত্যুক্তি হবে না।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিরোনামে কমিটি বলেছে "...... ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বত্র নৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায়। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিকতার প্রয়োগের মানসিকতা ও চরিত্র গঠন। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্মের মূল বিষয়গুলো জানবে"। কমিটির উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে "ইসলাম শিক্ষার" প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেনি। যেমন-

১। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে বা প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান হাসিলের ব্যবস্থা রাখা হয় নি ।

২। ইসলামের মূল কোরআন ও হাদিস। তা শেখার জন্যে আরবী ভাষা জানা অপরিহার্য। অথচ প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও ২য় শ্রেণীতে আরবী অক্ষর শেখানোর ব্যবস্থাও রাখা হয়নি।

৩। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার আড়ালে ইসলামী শিক্ষাকে অন্যান্য ধর্মের সমপর্যায়ে টেনে আনা হয়েছে।যেমন- অধ্যায়-৮ ধর্মও নৈতিক শিক্ষা শিরোনামের ৫.২ এ বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে- "ডিগ্রী ও মাস্টার্স স্তরে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অনুরূপ ব্যবস্থা হিন্দু,বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানধর্মের জন্যও প্রবর্তন করতে হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা কতে হবে। নিয়ন্ত্রণকারী বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী ও মাস্টার্স স্তরের হিন্দু, বৌদ্ধও খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। সকল শ্রেণীতে ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে । অথচ মাধ্যমিক, ডিগ্রী ও মাস্টার্স পর্যায়ে ইসলাম শিক্ষা বা ষ্টাডিজের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রতিফলিত হয়নি। তবে আরবী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এর সাথে সাথে ঐচ্ছিক বিষয়ের মাঝে আলকোরআন, আলহাদিস নেয়ার সুযোগ আছ। ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা পূর্ণাংগ নয়। ইসলামের ব্যক্তিগত নির্দেশ ও গুণাবলীর উল্লেখ করা হলেও পূর্ণাংগ ইসলাম শিক্ষার উল্লেখ করা হয়নি। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও উচ্চস্তর পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখা হয় নি। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ও ডিগ্রী পর্যায়ে ইসলাম শিক্ষার ন্যায় অন্যান্য ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

কমিটির রিপোর্ট, অধ্যায়-১, সার-সংক্ষেপের উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত ১৪নং সুপারিশে বলা হয়েছে ..."দেশের উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে অনুমোদিত ও প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের হতে হবে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় কোন ভাবেই সাম্প্রদায়িক ও বাণিজ্য-ভিত্তিক হতে পারবেনা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী হতে পারবে না"।

কমিটি 'সাম্প্রদায়িক' শব্দ ব্যবহার করে রাজনৈতিক একটি বিশেষ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে ও সার্বজনীন কল্যাণধর্মী প্রস্তাব রাখতে ব্যর্থ

হয়েছে। প্রকৌশল শিক্ষা, চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, কারবার (বিজনেস) শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা উপরোক্ত বিষয়গুলো শিক্ষার সাথে ইসলাম সম্পর্কে শেখার কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি।

কমিটির রিপোর্ট, অধ্যায়-১, সারসংক্ষেপ -এ ললিত কলা শিক্ষা শিরোনামের প্রথম লাইনে বলা হয়েছে ... "একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন, সুশৃংখল জাতি ও নাগরিক গোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য ললিত কলা শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরী ... " এবং ১নং সুপারিশে বলা হয়েছে "ললিত কলা বিষয়টি সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরে আবশ্যিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে"। বক্তব্যটি কমিটির এক বিষ্ময়কর দর্শন (?) বলা যায়। মূলত মার্জিত ও রুচিসম্মত ললিতকলা শিক্ষা নির্মল চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু সুরুচিসম্পন্ন ও ঐতিহ্য সচেতন নাগরিক গোষ্ঠী তৈরীর সহায়ক হতে পারেনা। কমিটির রিপোর্ট, অধ্যায় -১, সারসংক্ষেপ এ-৩নং সুপারিশে বলা হয়েছে "...সরকারি উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে জাতীয় চিত্রশালা, সংগীত ও নৃত্য একাডেমী ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে হবে"।

কমিটির রিপোর্ট, অধ্যায় সার-সংক্ষেপ-এর ৪নং সুপারিশে বলা হয়েছে "... সরকারী ও বেসরকারি উদ্যোগে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ভ্রাম্যমান চিত্রকলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে"। উপরোক্ত বক্তব্য বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ তথা কৃষ্টি কালচারের সাথে অসংগতিপূর্ণ।

কমিটির রিপোর্ট অধ্যায়-১, সার-সংক্ষেপ এ- বলা হয়েছে- "পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে সর্বদা নারীকে ঘিরে রাখা হয়েছে"। কমিটি ধর্মীয় গোঁড়ামি... মন্তব্য করে ইসলামী শরীয়াহ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর জঘন্য আঘাত হেনেছে, যাতে ধর্মের প্রতি কমিটির বিদ্বেষমূলক ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

"নারী শিক্ষা" বিষয়ে, অধ্যায়-১, সার-সংক্ষেপ এর ২ নং সুপারিশে বলা হয়েছে ... "প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচীতে যথার্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসূচীতে আনতে হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়"।

উপরোক্ত বক্তব্যে যথার্থ পরিবর্তন, প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমঅধিকারের কথা বলে বিশেষ দৃষ্টি ভংগীর (ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী) প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩ নং সুপারিশে বলা হয়েছে ... " প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচিত লেখা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে"। মহীয়সী নারী বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব সংক্রান্ত শিরোনামের ১নং সুপারিশে "শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর আধুনিকীকরণ প্রয়োজন" বলা হলেও নৈতিকতা শিক্ষার জন্যে ইসলামী শিক্ষার সুপারিশ করা হয় নি।

প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি জাতীয় আশা-আকাংক্ষা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরী করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। অধিকন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি যা সংবিধানে সংশোধিত হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি– এসব থাকা সত্ত্বেও এগুলোর ভিত্তিতে এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়নি।

বর্তমানে সরকার কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুপারিশ করার জন্য একটি পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করেছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্ত হওয়ার আগেই বর্তমান সরকার জাতির পিতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের ইমেজ প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ চিহ্নিতকরণ, বাঙালী সংস্কৃতির বিকাশ, বাঙালী জাতীয়তাবাদ, এই আলোকে প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সাহিত্য, সমাজ পাঠ, ইতিহাস সহ বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকে সংশোধন ও সংযোজন করে, দেশের ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনকে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে, নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার কৌশল গ্রহণ করেছে।

অধিকন্তু কমিশন ব্যাপকভাবে জাতীয় মতামত গ্রহণ ছাড়াই এর সুপারিশ সমূহ চূড়ান্ত করেছে। এ কমিশন কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট যদি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয় তবে অভিজ্ঞ মহলের মতে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আরও একটি চরম অব্যবস্থা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০

দেশের সর্বস্তরের মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করে তৎকালীন সরকার বিরোধীদল বিহীন জাতীয় সংসদে একতরফাভাবে বিতর্কিত "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০" পাশ করিয়ে নেয়। ডঃ কুদরাত-ই-খুদা প্রণীত শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করেই প্রফেসর এম. শামসুল হকের নেতৃত্বে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় তাই পরবর্তীতে "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০" নামে পাশ করানো হয়েছে। এতে ভাষা, বাক্য ও শব্দ প্রয়োগের মারপ্যাচে সেক্যুলার শিক্ষা চাপিয়ে দেয়া হয়। নিম্নে "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০" এর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো-

পর্যালোচনা ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০

ভূমিকা ১. 'ভূমিকা' এর চতুর্থ প্যারায় বলা হয়েছে,"......স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক মত বিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বিচার বিবেচনা করে কমিটি একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করে।"

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মত বিনিময় ব্যাপক আঙ্গিকে হয় নি। ১৯৭৬, '৭৮, '৮৩ ও ১৯৮৭ সালে শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে বিভিন্ন স্তরে যে ব্যাপক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল তা এক্ষেত্রে হয় নি। বরং লক্ষ্য করার বিষয় যে, প্রতিবেদন-১৯৯৭ তৈরি, অতঃপর এর মূল্যায়ন, এর উপর বিভিন্ন মহল থেকে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনার নামে মূলতঃ শিক্ষানীতিকে ভাষা, বাক্য ও শব্দ প্রয়োগের মারপ্যাঁচে ও আবর্তনে আওয়ামী লীগের দলীয় আদর্শের আলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আদর্শ ইসলামকে খন্ডিতরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

২. চতুর্থ প্যারার শেষাংশে বলা হয়েছে,"..........এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক ও চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশের উপর যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তেমনি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে দক্ষতা সৃষ্টির উপরও।"

পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, মৌলিক মানবীয় গুণাবলি সৃষ্টির জন্যে ও চারিত্রিক গুণাবলি বিকাশে সামাজিক সদাচরণ, ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রত্যয়

সৃষ্টি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি পালনের জন্যে এই নীতিমালায় কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

৩. ৭ম প্যারায় বলা হয়েছে, "................... আমাদের তরুণ সমাজের একাংশ আর্থ-সামাজিক কারণে হতাশাচছন্ন হয়ে বিপথগামী হচেছ, মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাসের পথ ধরছে। তাদের জন্য একটি সুস্থ, আশাপ্রদ ও সম্ভাবনাময় পরিবেশ তৈরি করা জরুরী।" উল্লেখিত বক্তব্যকে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রয়োজন দ্বীনি শিক্ষার ভিত্তিতে তরুন সমাজের চিন্তা-চেতনা জাগ্রতকরণ যা কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরী করবে; কিন্তু বর্তমান শিক্ষানীতি সে প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় নি।

অধ্যায়-১ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শীর্ষক নীতিমালায় মোট ১৫টি ক্রমে কমিটি খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এর অধিকাংশ দ্ব্যার্থবোধক ও অস্পষ্ট।

১. ১ নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা" বক্তব্যটি মার্জিত ও সুন্দর, তবে প্রণীত শিক্ষানীতির সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, উল্লেখিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের যথার্থ প্রক্রিয়া এতে অনুপস্থিত বরং ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনার প্রভাব সৃষ্টির কৌশলই এতে অবলম্বন করা হয়েছে।

২. ৩ নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "..................এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলাসহ জীবন যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।"-বক্তব্যটি চমৎকার কিন্তু সুনাগরিকের গুণাবলি সমৃদ্ধ চরিত্রবান মানুষ তৈরীর জন্যে প্রয়োজন বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীগণকে অনুসারী বানানো ও তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি তীব্রতর করা যা ঘোষিত শিক্ষানীতিতে স্থান পায় নি।

৩. ৬ নং ক্রমিকে বলা হয়েছে-"বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।" এখানে বলা যায় যে, কোন সুস্পষ্ট আদর্শের প্রতি প্রত্যয়, কোন বিশ্বজনীন আদর্শের অনুসরণ-অনুকরণ ছাড়া উল্লেখিত গুণাবলি সৃষ্টি সম্ভব নয়।

৪. ১১ নং ক্রমিকে "বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে ...." বক্তব্য দ্বারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠিত করার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. ১২ নং ক্রমিকে বলা হয়েছে "শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে নারী-পুরুষ বৈষম্য (Gender bias) দূর করা।" এ বাক্যটিও অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। এ বক্তব্য দ্বারা কি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে বা সমাজকে কোন দিকে ধাবিত করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

অধ্যায়-২ ঃ প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

১. ক. 'প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা' শীর্ষক বক্তব্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য সুপারিশ করা হলেও 'আদর্শ ফোরকনীয়া মক্তব' এর বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয়নি অথচ শিক্ষাদানের প্রাথমিক ভিত্তি হওয়া উচিত আদর্শ ফোরকানীয়া মক্তব।

২. খ. প্রাথমিক শিক্ষা উপশিরোনামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ৫নং ক্রমিকে বলা হয়েছে "শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকারসহ জীবন যাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা।" উল্লেখিত গুণাবলি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে দ্বীনি শিক্ষা ও মোটিভেশন অত্যন্ত জরুরী কিন্তু এ লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেই। আরো উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করার কথা বলা হলেও শিশুর মনে আখেরাতের চিন্তা লালনের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে

৩. এ অধ্যায়ে কৌশল শিরোনামে-বিভিন্ন ধারার সমন্বয় শীর্ষক-৩নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "........শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের

লক্ষ্যে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসমূহে আট বছর মেয়াদী শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করবে।" বক্তব্যে নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচীর কথা বলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে কোন দিকে নেয়ার টার্গেট (?) তা সুস্পষ্ট নয়।

৪. এ অধ্যায়ে কৌশল শিরোনামে-শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক শীর্ষক-৪নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বিষয়সমূহ হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি।" এখানে আরবী ও ইসলাম শিক্ষা রাখা হয় নি।

অধ্যায়-৪ ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা

১. কৌশল ঃ শিক্ষার মাধ্যম-শীর্ষক ১নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য ইংরেজী মাধ্যম চালু থাকবে, তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।" এখানে বাংলা ও ইংরেজীর কথা বলা হলেও আরবী শেখার ব্যবস্থা রাখা হয় নি।

২. কৌশল ঃ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য পুস্তক-শীর্ষক ২নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের তিনটি ধারায় অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে হবে।"-এ বক্তব্যে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসরণ দ্বারা মাদ্রাসা শিক্ষার ভীতকে ধ্বংস করার দুরভিসন্ধিমূলক প্রদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যা দ্বারা ব্যাপকভাবে ইসলামী জ্ঞান চর্চা ব্যাহত হবে। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষার ধারায় ইসলামী বিষয় বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয় নি।

অধ্যায়-৫ ঃ বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) ও কারিগরি শিক্ষা

এ অধ্যায়ে বিভিন্ন দিকের পথ নির্দেশনা রয়েছে। লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কথার ফুলঝুরি সাজানো হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে নিছক উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মানুষ যে নৈতিক জীব ও সামাজিক জীব এ দর্শন এখানে অনুপস্থিত।

অধ্যায়-৬ ঃ মাদ্‌রাসা শিক্ষা

১. মাদ্‌রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ইসলামকে একটি জীবন আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করা হয় নি। বরং ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম ও নৈতিক বিধানরূপে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনার শেষাংশে বলা হয়েছে, "........শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদ্‌রাসা শিক্ষার অভিন্ন বিষয়সমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।" এ মন্তব্যটি ইসলামী বিষয়সমূহ কমিয়ে ও গুরুত্ব কম দিয়ে মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র ধারা ও দ্বীনি ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে সেক্যুলার শিক্ষা কাঠামোতে রূপান্তরিত করার কৌশল মাত্র।

৩. 'কৌশল'-এর ৭নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, " সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ধারায়ও অনুসরণ করতে হবে। তবে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে (যথা-ইংরেজী, বাংলা, অংক, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, কলা, কারিগরী শিক্ষা) বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক মূল্যায়ন করবে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরী শিক্ষা বোর্ড। ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বে থাকবে।"-এ বক্তব্য দ্বারা মাদ্‌রাসা শিক্ষা কাঠামোকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

৪. 'কৌশল'-এর ৮নং ক্রমিকের শেষাংশে বলা হয়েছে "..........তবে মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচচ পর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচচ পর্যায়ের মধ্যে ডিগ্রির সমতা সরকার নির্ণয় করবে।" -এ মন্তব্য দ্বারা মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও মাদ্‌রাসা ছাত্রদের সাথে সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

অধ্যায়-৭ ঃ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

এ অধ্যায়ে ইসলাম শিক্ষাকে অন্যান্য ধর্মের পাশাপাশি একটি ধর্ম হিসেবে দেখানো হয়েছে, অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান -এ ধারণা ও চেতনায় উজ্জিবীত হওয়ার মত কোন দিক নির্দেশনা নেই।

অধ্যায়-৮ ঃ উচচশিক্ষা

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শীর্ষক বক্তব্যে ২নং ক্রমিকে বলা হয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি।" যোগ্য

নাগরিক সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন হচেছ ইসলামী শিক্ষা অথচ সুপারিশে তা রাখা হয়নি।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শীর্ষক বক্তব্যে ৪নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য উচচ শিক্ষার জন্য নীতি হবে ঃ

* বিজ্ঞান মনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমূখী, প্রগতিশীল ও দুরদর্শী।

* অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তাদানকারী ও নিশ্চয়তাদানকারী।"

উল্লেখিত বক্তব্য ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব লালন ও প্রচার এবং দ্বীনের ব্যাপারে অশালীন মন্তব্য করার সুযোগ সৃষ্টির আলামত বলা যায়।

৩. 'কৌশল'-এর ৮নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "উচচ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের।" বক্তব্যটি চমৎকার কিন্তু আদর্শ নাগরিক তৈরির দিক নির্দেশনা এতে অনুপস্থিত।

৪. 'কৌশল'-এর ১৬নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "এই সব বিশ্ববিদ্যালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোন কারণেই বৈষম্যমূলক হতে পারবে না।" - এ বক্তব্য এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আদর্শ ইসলাম শিক্ষার ব্যাপক চর্চা ও সম্প্রসারণকে বাধাগ্রস্থ, সংকুচিত ও নিশ্চিহ্ন করার কৌশল মাত্র।

অধ্যায় ঃ ৯-১৪

নবম অধ্যায়ে 'প্রকৌশল শিক্ষা', দশম অধ্যায়ে 'চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা', একাদশ অধ্যায়ে 'বিজ্ঞান শিক্ষা', দ্বাদশ অধ্যায়ে 'কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা', ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'কারবার (বিজনেস) শিক্ষা', চতুর্দশ অধ্যায়ে 'কৃষি শিক্ষা' সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় ও সুন্দর নীতিমালার কথা বলা হয়েছে। আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে এ সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের মানব কল্যাণ, উপার্জন, উৎপাদন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অনেক হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যও উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ তাদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ, তাদের নৈতিক উৎকর্ষতার সৃষ্টি, তাদের সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ও তাদের সুশিক্ষিত মার্জিত করে গড়ে তোলে প্রকৃত মানব প্রেম সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় আদর্শের পথনির্দেশনা শিক্ষানীতিতে নেই। এই সকল শিক্ষার্থীর জন্যে নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সাথে

সম্পৃক্ততা গড়ে তোলার মধ্যে কোন নীতিমালার উল্লেখ নেই। এ ধরনের অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট নিছক আবেগ ও উচছাসজড়িত প্রক্রিয়া ও নীতি দেশ ও জাতিকে কল্যাণের পথে ধাবিত করতে পারে না। এসব অবাস্তব পন্থা ও প্রক্রিয়া দেশ ও জাতিকে সুনিশ্চিত ধ্বংস-কলহ ও নিত্যসংঘাত-বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করবে।

অধ্যায়-১৫ ঃ ললিতকলা শিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর আলোচনায় বলা হয়েছে, "একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্যে ললিতকলা শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরী। ললিতকলার অর্ন্তগত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও নানাবিধ হাতের কাজ, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে।...........দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়.......... ।"

আলোচ্য অধ্যায়ের কৌশল ১ এ বলা হয়েছে, "ললিতকলা শিক্ষাদান বিষয়টিকে একটা পেশা ভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।"

কৌশল ২ এ বলা হয়েছে, "ললিতকলা বিষয়টিকে সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে আবশ্যিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে।"

কৌশল ৫ এ বলা হয়েছে, "সরকারী উদ্যোগে ও অর্থানুকুল্যে জাতীয় চিত্রকলা, সংগীত ও নৃত্য একাডেমী ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

কৌশল ৬ এ বলা হয়েছে, " সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ভ্রাম্যমান চিত্রকলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।"

উপরোক্ত বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, আলোচ্য অংশে ললিতকলার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও চিত্র উত্থাপিত হয় নি। এ বক্তব্য দ্বারা ইসলামী শরিয়া ও মূল্যবোধের উপর জঘন্য আঘাত হানা হয়েছে। চিত্রশালার নামে জাতিকে মূর্তিপ্রীতি ও মূর্তিপূজার পথে পরিচালনা; সংগীত,

নৃত্য ও সংস্কৃতির নামে নগ্নতা, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার পথে ধাবিত করার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। আলোচ্য বক্তব্যসমূহে আকর্ষণীয় শব্দমালায় আমাদের কিশোর-কিশোরীদের ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য পরিপন্থী অপসংস্কৃতির পথে ধাবিত করার চক্রান্ত নিহিত রয়েছে।

অধ্যায়-১৬ ঃ আইন শিক্ষা

এ অধ্যায়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কৌশল শীর্ষক মোট ৯টি ক্রমে বিভিন্ন নীতিমালার পথনির্দেশনা রয়েছে। অথচ এ অধ্যায়ে ইসলামী আইন, দর্শন, ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য, ইসলামের ফৌজদারী আইন ও দেওয়ানী আইন কোন কিছু সম্পর্কেই কোন নীতিমালার উল্লেখ নেই। উপরন্তু আইন শিক্ষায় দ্বীনি শিক্ষার প্রতিফলন না থাকলে এটাকে ন্যায়নিষ্ঠ ও সেবাধর্মী করা অসম্ভব।

অধ্যায়-১৭ ঃ নারী শিক্ষা

'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,-এর আলোচনায় বলা হয়েছে, "............পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে সর্বদা নারীকে ঘিরে রাখা হয়েছে।"

দ্বিতীয় প্যারায় বলা হয়েছে, "নারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা, সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গী প্রখর করা, সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করা,................এবং যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে পারেন এমন দৃষ্টিভঙ্গী ও আত্মপ্রত্যয় নারীর মধ্যে সৃষ্টি করা।" এ অধ্যায়ের কৌশল ৫ এ বলা হয়েছে, "প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচিতে যথার্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে......।"

আলোচ্য বক্তব্যে নারী শিক্ষা সম্পর্কে বহু গালভরা বুলি আওরানো হয়েছে। অথচ ইসলাম যে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করেছে, নারীকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে, নারী অধিকারকে সমুন্নত করেছে তা শিক্ষার মাধ্যমে নারীদেরকে বুঝার ও অনুশীলনের ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়

নি বরং ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক ধারণা সৃষ্টি ও লালনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। নারীদেরকে আদর্শ মা, গৃহিনী ও জীবন সঙ্গীনি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে চরিত্র বিধ্বংসী সহশিক্ষার বিলুপ্তি সাধন, মহিলা মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ নেই।

অধ্যায়-১৮ ঃ বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্লস গাইড

স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা শিরোনামে 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' আলোচনার তৃতীয় প্যারায় বলা হয়েছে, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি শরীর চর্চা ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে তা হলে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলে মেয়েদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। মাদকদ্রব্যের মত ভয়াল অভিশাপ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে না যদি তারা উপযুক্ত খেলাধুলার পরিবেশ পায়।"

ভয়াল অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যে প্রয়োজন দ্বীনি শিক্ষার ও মন-মানসিকতায় তাকওয়ার প্রভাব জাগ্রত করা যা এ বক্তব্যে ও কৌশলে রাখা হয় নি।

অধ্যায়-২৫ ঃ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর আলোচনায় বলা হয়েছে "........... শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে.....।" বক্তব্যটি সুন্দর। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক যা বর্তমানে চালু আছে, তা পুনর্বিন্যাস করে ঢেলে সাজাতে হবে। যা আলোচ্য অংশে উল্লেখ করা হয় নি।

অধ্যায়-২৭ ঃ শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ

১. ২নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, "........মিশনারী, ট্রাস্ট ও দেশী বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বরাদ্দ দেয়া চলবে না।"

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ ট্রাস্ট/সোসাইটিসহ বিভিন্ন সংস্থা গঠন করে এর অধীনে নিছক সমাজ ও মানবসেবা এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের মহান লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠা

প্রতিষ্ঠানগুলোর এক পর্যায়ে সরকারী অনুমোদন চাওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী অনুদান পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু উক্ত ধারায় ট্রাস্ট, সোসাইটি এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বরাদ্দ না দেয়ার সুপারিশের কারণে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় নিরুৎসাহিত হবেন। এতে সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নয় বরং শিক্ষা সংকোচনের নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সংযোজনী-২

১. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় তালিকায় (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থায় ঐচ্ছিক বিষয়াদির মধ্যে আরবী/সংস্কৃতি/পলি থাকলেও ইসলামিয়াত রাখা হয়নি।

২. ভোকেশনাল শিক্ষা উপশিক্ষার কোন পর্যায়েই ইসলামিয়াত/ধর্ম শিক্ষা রাখা হয়নি।

৩. মাদ্রাসার আলিম স্তরে (বিজ্ঞান শাখায়) ফিকহ ও আকায়েদ, আরবীকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্ধারিত করে এবং কুরআন, হাদীস ও আরবীতে মাত্র ১০০ নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা করে মাদ্রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করার পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উপসংহার ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কৌশল ও পদক্ষেপসমূহ জাতির অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০' মূলতঃ ১৯৭৪ সালে প্রণীত ডঃ কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের নব্যসংস্করণ। এই শিক্ষানীতিতে বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সর্বোপরি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আদর্শ ইসলামের প্রতিফলন ঘটে নি। বরং নামে মাত্র ধর্মীয় শিক্ষা রেখে নবপ্রজন্মের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা লালন ও প্রতিষ্ঠিত করে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বানানোর সুদুর প্রসারী কৌশল গৃহীত হয়েছে। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে আমাদের জাতিসত্তা ও ইসলামী মূল্যবোধের ক্রমশ বিলুপ্তি ঘটবে। বিজাতীয় সংস্কৃতির অক্টোপাশে আটকা পড়বে আমাদের প্রজন্ম ও বংশধর।

চারদলীয় জোট সরকারের শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত দুটি কমিটি

২০০১ সালের অক্টোবর মাসে চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার জরুরী সংস্কারের জন্য দুটি কমিটি গঠন করে। কমিটি দুটি নিম্নরূপ ঃ

এক. শিক্ষা সংস্কার কমিটি

২৪ ডিসেম্বর ২০০১ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ডঃ আবদুল বারীর নেতৃত্বে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট "শিক্ষা সংস্কার কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করে। দীর্ঘ সাত মাস কাজ করার পর উক্ত কমিটি গত ১৮ জুলাই-২০০২ সালে তাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করে। সাতটি সাব কমিটির রিপোর্টের সমন্বয়ে রচিত এই রিপোর্টটিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য সরকারের নিকট বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করা হয়।

দুই. মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি

গত ১২ জানুয়ারী ২০০২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ভিসি ডঃ মুস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট 'মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি' নাম দিয়ে অপর একটি কমিটি গঠন করে। গত ১১ মার্চ-২০০২ সালে উক্ত কমিটি সরকারের নিকট কিছু সুপারিশপেশ করে।

আমাদের দেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও ধরন

আমাদের দেশের শিক্ষার অতীত ইতিহাস রয়েছে। ইংরেজ শাসনের আগে মুসলিম শাসন আমলে এ দেশে একক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। জনগণের মাঝে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল। এই ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে বৃটিশ আমলে দু ধরনের শিক্ষার প্রচলন করা হয়, সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা।

পাকিস্তান আমলেও সে ধারা অব্যাহত রাখা হয়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে।

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এ শিক্ষা প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে বিভক্ত।

প্রাথমিক স্তরঃ শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। সরকারী ও বেসরকারী ভাবে এ শিক্ষা পরিচালিত হয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ৬৫,৬১০ । এছাড়া বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়ও রয়েছে।

অসংখ্য এন.জি.ও. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নামে হাজার হাজার স্কুল পরিচালনা করছে। এ পর্যায়ের সিলেবাস, কারিকুলাম, পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ শেখার কোন ব্যবস্থা নেই। বরং এন. জি. ও. পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক স্তরঃ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা তিনটি পর্যায়ে বিভক্তঃ নিম্ন মাধ্যমিক তিন বছর, মাধ্যমিক দু'বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক দু'বছর। দেশে বর্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩,০২৪ , মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪,০৬৯, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের সংখ্যা ঃ বেসরকারী ১,২৮৯ ও সরকারী ২১টি, ক্যাডেট কলেজ- ১০টি।

ডিগ্রী-মাস্টার্স ঃ স্নাতক, স্নাতক সম্মান, মাস্টার্স, মেডিকেল শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে ডিগ্রী

কলেজ সংখ্যা সরকারী ২৫১, বেসরকারী ৭২৭ বিশ্ববিদ্যালয় ১৫টি, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ৩০টি, বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি, মেডিকেল কলেজ সরকারী-১৩টি, বেসরকারী ১১, ডেন্টাল কলেজ-সরকারী-১, বেসরকারী -১, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৪ ও কৃষি কলেজ ৪টি রয়েছে।*

English Medium School :

দেশে বেশ কিছু English Medium স্কুলও রয়েছে, যেখানে Secular Educationই চালু রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছেঃ

Scholastica ধানমন্ডি, গুলশান এবং উত্তরাতে	
Maple Leaf	ধানমন্ডিতে
Sunbeam.	"
Oxford International	"
BIT	বনানী এবং গুলশানে
American International School	গুলশানে

এ প্রসংগে Manarat International School & College বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানেই কিছুটা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করা হয় (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াত ও আরবী বাধ্যতামূলক রয়েছে)।

এসব English Medium School গুলো London University (অবশ্য কয়েকটি Cambridge University)র সাথে Affiliated এবং British Council, Dhakaর সাথে Registered.

বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) ও কারিগরি শিক্ষা ঃ বিভিন্ন পেশা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পলিটেকনিক ২০টি, ল কলেজ ৪২টি, হোম ইকোনোমিকস কলেজ ১টি, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট ১টি, ডিপ্লোমা ইন কমার্স ৫টি ও ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং- ৩টি, বাংলাদেশ ভকেশন্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট- ৩৩টি, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সরকারী ১২টি ও প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ৫৪টি রয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারী উদ্যোগে ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

---
* Annex -I

আই. ইউ. টি. **(সাবেক আই সি টি ভি টি আর)**

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ঢাকা ঘোষণা অনুযায়ী ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজী (আই সি টি ভি টি আর) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টংগী থানার বোর্ড বাজার নামক স্থানে অবস্থিত। এতে ও. আই. সির সদস্য দেশসমূহ থেকে ছাত্র ভর্তি করা হয়। আই. ইউ .টি; তে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী এবং সকল শিক্ষার্থীকে ইংরেজীতে বিশেষ দক্ষতার সার্টিফিকেট পেশ করতে হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এ উচ্চতর ডিপ্লোমা, কারিগরি শিক্ষায় এম এসসি, কারিগরি শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও বি এসসি এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান ধারাও বৃটিশ আমলে সৃষ্ট। এ ধারায় দু'টি ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী আলীয়া নেসাব, দারসে নিজামী বা খারেজী নেসাব। এছাড়াও রয়েছে হাফেজী মাদ্রাসা।

সরকারী আলীয়া নেসাব ঃ এগুলো সরকারী অনুদানভুক্ত ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এ পর্যায়ে সরকারী কামিল মাদ্রাসা রয়েছে ৩টি। বেসরকারী পর্যায়ে কামিল মাদ্রাসা ১৪১টি, ফাজিল মাদ্রাসা ১০০০টি, আলিম মাদ্রাসা ১০৯০টি, দাখিল ৪৮৬৫টি । তাছাড়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ১৭,৬০০।*

এ সকল মাদ্রাসায় সিলেবাস-কারিকুলাম এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যার ফলে শিক্ষার্থীগণ ইসলাম কে একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জানার সুযোগ পাচ্ছে না। নিজেদেরকে সমাজ পরিচালনার যোগ্য নাগরিক হিসেবেও গড়ে তুলতে পারছে না। বর্তমানে বেশ কিছু মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ও চালু আছে।

মাদ্রাসার বিবরণ – ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত

	মঞ্জুরি প্রাপ্ত	**অনুমোদিত ও অননুমোদিত**
ইবতেদায়ী	৯,৫৪১ (স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী)	১৭,৩৫৭
দাখিল	৪,৮১১	৭,৩৯৫
আলিম	৯৯৭	১,০২০
ফাজিল	৮৯০	
কামিল	১১২	১১৫

* বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই-২০০০ ইং

দারসে নিজামী বা কাওমী মাদ্রাসা

বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণে সর্ব প্রথম কাওমী মাদ্রাসা স্থাপিত হয় ১৯০১ সালে, চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় 'মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী' মাদ্রাসা নামে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এ দেশে কাওমী মাদ্রাসা ছিল ৪৪৩ টি। তন্মধ্যে ৫১টি ছিল দাওরা হাদীস মাদ্রাসা। বর্তমানে ছোট-বড় কাওমী মাদ্রাসার সংখ্যা ছয় হাজারেরও অধিক। এগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং জনগণের অর্থে পরিচালিত। এ সকল মাদ্রাসায় সরকারী সিলেবাস কারিকুলাম নেই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে "দারুল উলূম দেওবন্দ"ই কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করত। দেশ বিভক্তির পর এতদঅঞ্চলের মাদ্রাসাগুলো দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন নামে বেশ কিছু শিক্ষা বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। তন্মধ্যে 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা' নামক কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

হাফিজি মাদ্রাসা ঃ হাফেজে কুরআন তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য হাফিজি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল মাদ্রাসায় শুধুমাত্র কুরআন হিফজ (মুখস্থ) করার ব্যবস্থা রয়েছে। কুরআন বুঝা, ইসলাম সম্পর্কে জানার উপযোগী কোন কারিকুলাম ও সিলেবাস নেই। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সামাজিক সাহায্য সহযোগিতায় এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

এ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে আসছিল। ১৯৭৭ সালে ও. আই. সির উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে তিনটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় জনগণের আন্দোলন ও ওআইসির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য সমূহ ছিল ঃ–

(১) কলা ও বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সাথে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন।

(২) এমন প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরী করা যারা ইসলামী শিক্ষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করবে, সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষার মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়েও উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করবে। সমাজ পরিচালনার যোগ্যতা হাসিল করে জনগনের সামনে নিজেকে ইসলামী আদর্শ ও মুল্যবোধের মুর্ত প্রতীক হিসেবে পেশ করতে পারবে।

(৩) সম্পূর্ণ আবাসিক, স্বায়ত্ত-শাসিত শিক্ষা গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যাতে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা হবে। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার উপর বিশেষ গবেষণা হবে।

(৪) ইসলামী শিক্ষা বিশেষ ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন।

(৫) ঐশিক ও জাগতিক জ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশে একটি সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা।

(৬) মুসলিম যুবকদের মধ্য থেকে বিভিন্ন বিষয় ও বিভাগে স্কলার্স তৈরী করা।

প্রকৃত পক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ছিল জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জ্ঞানেরই বিস্তার এবং ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান।

এ মহৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭৯ সালে যশোর-কুষ্টিয়া সীমান্তের শান্তিডাঙ্গায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের মাধ্যমেই শুরু হয় নানা রূপ ষড়যন্ত্র। স্থান নির্বাচনটি অযৌক্তিক হওয়ায় দীর্ঘ চার বছর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ স্থগিত থাকে। রাজধানী ঢাকার আশে-পাশে কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জাতি দাবী জানিয়ে আসছিল।

১৯৮৩ সালে এইচ, এম, এরশাদ সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থানান্তর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেয় এবং গাজীপুরে নতুন ক্যাম্পাসের নির্মান কাজ শুরু করে। ১৯৮৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়। ১৯৮৯ সালে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন বছর পরে 'ছাত্র অসন্তোষের' খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে এরশাদ সরকার কুষ্টিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের ঘোষণা দেয়। সরকারী এ ঘোষণার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও আন্দোলন হয়। কিন্তু সরকার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অটল থাকে এবং তা বাস্তবায়ন করে। দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজধানীতে রেখে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেয়ার জনগনের দাবীকে এভাবে প্রত্যাখান করা হয়।

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফলে আজ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী চরিত্র বিলুপ্ত প্রায়। ইসলামী বিষয় ও বিভাগ কমিয়ে সাধারণ বিষয় ও বিভাগ বৃদ্ধি এবং দেশের অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সহ-শিক্ষা চালু করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কে সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হচ্ছে। বিগত বি এন পি সরকারের আমলেও একই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী চরিত্র ও পরিবেশ বিনষ্ট করে দলীয় প্রভাব সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিনত করার চেষ্টার পরিবর্তে সরকার এর অস্তিত্বই ধ্বংস করার সকল কলা-কৌশল গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এর প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ অধিবাসী মুসলমান। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে খাঁটি মুসলমান তৈরীর উপযোগী কোন শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে নেই।

আমাদের দেশে বর্তমানে দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। এক, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা। দুই, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইংরেজ প্রবর্তিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যার ফলে শিক্ষার্থীরা ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা শেখার তেমন কোন সুযোগ পায়না। পক্ষান্তরে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ইসলামকে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা রূপে শিক্ষা দেয়ার কোন ব্যবসস্থা নেই। তাছাড়া এখানে কারিগরী শিক্ষা না দেয়ার ফলে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করার পরও তাদের অধিকাংশই বেকারত্বের অভিশাপে নিপতিত হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার এ মৌলিক ত্রুটি দূর করা খুব সহজ কাজ নয়। এর জন্য সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন শাখা বিশেষ ভাবে ইসলামী শিক্ষার উপর গবেষণা অতীব প্রয়োজন। তথ্য- ভিত্তিক প্রয়োগমুখী গবেষণার মাধ্যমেই বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে একটা সমন্বিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব। এ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কতিপয় ইসলাম প্রিয় শিক্ষাবিদ এগিয়ে আসেন।

বিষয়টি নিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সাথে আলোচনা করা হয়। এর ভিত্তিতে ১৯৭৮ সালে অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব (বর্তমান পরিচালক) কে আহ্বায়ক করে 'ইসলামিক এডুকেশন কমিটি' গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন মরহুম মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, মাওলানা আবদুল জাব্বার চাখারী, অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ ও আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ।

পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালের আগষ্ট মাসে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ

আলীকে চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রবকে সেক্রেটারী করে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি গঠন করা হয়। ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন মাওলানা আবদুল জাব্বার চাখারী, এ. কে. এম. নাজির আহমদ, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আবদুল কাদের মোল্লা ও আবদুল মান্নান তালিব। এ সময় থেকে গভঃ রেজিস্ট্রার্ড সংস্থা হিসেবে কাজ করে আসছে।

যে সব উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি গঠিত হয় তা হলো ঃ

- সম্ভাব্য সকল উপায়ে জন সাধারণের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রসার।
- সাধারণ শিক্ষার উপর বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার উপর গবেষণা।
- শিশু-কিশোরদের জন্য উন্নততর শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকল্পে আর্দশ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা।
- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শিক্ষা সম্মেলন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করণ।
- ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক সাময়িকী, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ।

শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী করণে এডুকেশন সোসাইটির ভূমিকা

জাতির আশা-আকাংক্ষার আলোকে একটি আদর্শ শিক্ষানীতি উপহার দিতে সরকারী ব্যর্থতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ নির্মূলের সরকারী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয় আশা-আকাংক্ষার ভিত্তিতে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে, নতুন প্রজন্মকে আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বেসরকারী উদ্যোগে যে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে সে ক্ষেত্রে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা হচ্ছে–

(১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কুরআন, সুন্নাহর মূলনীতি ও ইসলামী মূল্যবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে খসড়া কারিকুলাম ও সিলেবাস তৈরি করা।

(২) দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, লেখক, সাহিত্যিকদের দ্বারা শিশু-কিশোরদের উপযোগী ইসলামী সাহিত্য, টেক্সট বুক ও রেফারেন্স বুক তৈরী এবং

প্রকাশ করার বিরাট কাজ চালিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে সোসাইটি এ পর্যন্ত ৮৯টি প্রকাশ করেছে।

এর মাঝে বেশ কিছু পুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ও জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (N.C.T.B) কর্তৃক অনুমোদিত এবং সোসাইটির সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সেরা স্কুল মাদ্রাসায় পাঠ্য তালিকাভুক্ত রয়েছে।

(৩) যোগ্য শিক্ষক তৈরী ও শিক্ষকদের মানোন্নয়ন এবং ছাত্রদের মাঝে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী তৈরীর কলা-কৌশল শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষকদের অভিজ্ঞ ও পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।*

প্রতি বছর ইংরেজী, আরবী, সাধারণ বিষয় সহ বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক চার পাঁচ দিনব্যাপী চার, পাঁচটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়।

এছাড়া এ কর্মসূচীকে আরও ব্যাপক করে বেশী সংখ্যক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিভাগ ও অঞ্চল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরু করা হয়েছে এবং প্রতিবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়ে সম্মেলনও করা হয়।

(৪) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্য পুস্তক পর্যালোচনার জন্য সোসাইটিতে কর্মরত রিসার্চ স্কলার সহ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের নিয়োজিত করা হয় এবং তাঁদের পর্যালোচনার পর ইসলাম বিরোধী বিষয়াবলী নির্দেশ করে শিক্ষকদের সেই ইসলাম বিরোধী বিষয়ে সজাগ করা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে পেশ করার কৌশল শিক্ষা দেয়া, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তা সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ্, সোসাইটির পরামর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ১টি বই এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড ১টি বইয়ের অনুমোদন কয়েক বছর পূর্বে প্রত্যাহার করে নেয়।

(৫) ইসলামী আদর্শ, চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের আলোকে বাংলা, ইংরেজী, আরবী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরীর জন্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, লেখক, ইসলামী চিন্তাবিদদের নিয়োজিত করা হয়েছে এবং তাঁদের রচিত বই সমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে।

---

* Annex -II

(৬) সারাদেশে ইসলাম প্রিয় লোক ও সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আদর্শ মক্তব, স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করা হয়ে থাকে।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী সংগঠন সংস্থা ও সোসাইটিগুলোর কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য ফেডারেশন Federation of Islamic Societies and Trusts (FIST) গঠনের মাধ্যমে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

(৮) আদর্শ স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোর সিলেবাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

(৯) আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার প্রেরণা দেয়া হয়। এছাড়া সরাসরি সোসাইটির পরিচালনায় আই. ই. এস. স্কুল, আদর্শ ইয়াতিম খানা, আদর্শ ফোরকানীয়া, ডাকযোগে ইসলাম শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। সম্প্রতি আদর্শ হেফজ খানা ও নৈশ বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিও চলছে।

(১০) প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে বিগত সরকারের আমলে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিরুদ্ধে এবং ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়নের পক্ষে সোসাইটির কার্যক্রম ও ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে।

(১১) স্কুল ও মাদ্রাসার পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মেধা পরীক্ষার মাধ্যমে আই. ই. এস. স্টাইপেন্ড চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সারাদেশে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

(১২) দীর্ঘদিন যাবত ডাকযোগে ইসলাম শিক্ষা কর্মসূচী (ডাইশিক) পরিচালনা করা হচ্ছে। দু'টি কোর্সে বিভক্ত এ কর্মসূচীতে প্রায় ৫ হাজার কিশোর অংশ গ্রহণ করে থাকে।

(১৩) সোসাইটির সাথে সংশ্লিষ্ট স্কুল, মাদ্রাসা, আদর্শ মক্তব পরিদর্শন করার চেষ্টা করা হয়।

(১৪) বাংলাদেশে জনগণের মাঝে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার সূতিকাগার হচ্ছে সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজর মক্তব ও ফোরকানীয়া

মাদ্রাসা। সরকারী কোন সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই জনগণের অর্থায়ন ও উদ্যোগেই পরিচালিত হচ্ছে এ সকল প্রতিষ্ঠান। এ সকল মক্তব ও ফোরকানীয়া মাদ্রাসাগুলোর জন্য সরকারের কোন কারিকুলাম বা সিলেবাস নেই। ফলে এর থেকে যথাযথ ফায়দা পাওয়া যাচ্ছে না। আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি এ শূন্যতা পূরণ করার জন্য আদর্শ ফোরকানীয়া মক্তবের একটি ফলপ্রসূ ও যুগোপযোগী কারিকুলাম, সিলেবাস ও টেক্সটবুক প্রণয়ন করেছে, যার আওতায় ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় ও সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ১৭৮টি ফোরকানীয়া মক্তব পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সারাদেশে বেশ কিছু আদর্শ মক্তব রয়েছে।

সাধারণ মক্তব-ফোরকানীয়া মাদ্রাসার মত সময় বা শ্রম কম দিয়ে তার চেয়েও কয়েক গুণ বেশী ফায়দা এর মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। সাধারণ ফোরকানীয়া মক্তবের মত দেড় থেকে দু' ঘন্টা সময় নিয়েই ক্লাশ হবে। ছাত্র-ছাত্রীগণ আদর্শ ফোরকানীয়া মক্তবের কারিকুলাম ও সিলেবাস অনুসরণ করার ফলে কুরআন শুদ্ধরূপে পড়তে পারবে। তারা ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে এবং বাংলা ও অংকের প্রাথমিক ধারণাও লাভ করবে-ইংরেজী বর্ণমালার সাথেও পরিচিত হবে। ফলে যারা এরপর আর আর্থ-সামাজিক কারণে পড়াশুনার সুযোগ পাবে না তারাও কিছুটা শিক্ষিত হতে পারবে।

অন্যদিকে এ ফোরকানীয়া মক্তবের শিক্ষা জীবন শেষ করে মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য সাধারণ স্কুল, মাদ্রাসায় ২য়/৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ভাল ছাত্র হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারবে।

জনগণের ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংস করার জন্য সারা দেশে এন.জি.ও. পরিচালিত হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, গণ সাহায্য সংস্থা সহ অসংখ্য সংস্থার এ কার্যক্রম মোকাবেলার জন্য আদর্শ ফোরকানীয়া মক্তব কার্যক্রম একটি সফল ও পরীক্ষিত ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর করা যেতে পারে। বাংলাদেশ চাষীকল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ইসলামিক ওয়ার্ল্ড কমিটি বাংলাদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি সংস্থা কিছু মক্তব পরিচালনা করছে।

১৫) কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও শিক্ষার ইসলামীকরণের উপর সোসাইটির উদ্যোগে কয়েকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ এ আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন। এ সকল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণকে বিভিন্ন বিষয়কে (Subjects) ইসলামী আদর্শ ও দৃষ্টিভংগীর আলোকে তৈরী করার দায়িত্ব দেয়া হয়।

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, আল-হামদুলিল্লাহ। প্রতিষ্ঠানে ইসলামী পরিবেশ তৈরী, ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামী আমল-আখলাকে গড়ে তোলার সাথে সাথে লেখা পড়ায়, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বোর্ড পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে আসছে। স্থানীয় ও সরকারী বৃত্তি প্রাপ্তিতে শীর্ষস্থান দখল ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি দ্বারা পরিচালিত।

বর্তমানে যারা কমিটিতে রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন–

১. অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ এম. এ	চেয়ারম্যান
২. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব এম. এ	ডিরেক্টর
৩. জনাব আবদুল কাদের মোল্লা বি. এস. সি, ডিপ-ইন-এড, এম.এড	সদস্য
৪. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলী আকবর এম. এ.	সদস্য
৫. এ. টি. এম. আজহারুল ইসলাম এম. এ.	সদস্য
৬. ডক্টর মোহাম্মদ লোকমান এম. কম	সদস্য
৭. মাওলানা মোঃ যাইনুল আবেদীন এম. এম. এম.এ.	সদস্য
৮. জনাব রফিউদ্দিন আহমদ এম. এম.	সদস্য

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে অতিপরিচিত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে) এ সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে। 'আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মানব জীবনের পুনর্বিণ্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ণ করার জন্য ইসলামী ছাত্র শিবির পাঁচ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর মাঝে চতুর্থ দফা কর্মসূচী হলো ছাত্র সমস্যা ও ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন। এ দফায় বলা হয়েছে 'আদর্শ নাগরিক তৈরীর উদ্দেশ্যে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের দাবীতে সংগ্রাম এবং ছাত্র সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান।'

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি, সমস্যা চিহ্নিত করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শহীদ আব্দুল মালেকের শাহাদাত দিবস ১৫ই আগষ্ট 'ইসলামী শিক্ষা দিবস' হিসাবে পালন করছে। এ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে তিনটি শিক্ষা সেমিনার আয়োজন করেছে। এ সকল সেমিনারে দেশ বিদেশের শিক্ষা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিক্ষক, ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবিগণ অংশগ্রহণ করেন এবং সেমিনার উপলক্ষে সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখা নিয়ে তিনটি' শিক্ষা সেমিনার স্মরণিকা' প্রকাশ করেছে।

এছাড়াও শাখা পর্যায়ে বিভিন্ন সময় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা ইত্যাদি প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর দাবীতে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিকট বিভিন্ন সময়ে স্মারকলিপি প্রদান করে। ১৯৯৭ সালে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য প্রফেসর মুহাম্মদ শাসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির নিকট ও জাতীয় আদর্শ ইসলামের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য স্মারকলিপি প্রদান করে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি প্রণীত ও প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আধুনিক আঙ্গিকে ঢেলে সাজানো এবং সর্বোপরি দেশে একক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে সোসাইটি কাজ করে যাচেছ। এ উদ্দেশ্যে ফোরকানিয়া ও প্রাইমারীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শিশু শ্রেণী থেকে শুরু করে উপরের শ্রেণীগুলো পর্যন্ত উন্নতমানের পুস্তক রচনার কাজ হাতে নিয়েছে। সৎ, যোগ্য ও সত্যিকার আল্লাহ্ বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে শিশু-কিশোরদেরকে গড়ে তোলার জন্য পুস্তকগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সোসাইটি প্রণীত ও প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

১) ছোটদের ইসলাম শিক্ষা-১, প্রথম শ্রেণীর উপযোগী
২) ছোটদের ইসলাম শিক্ষা-২, দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৩) ছোটদের ইসলাম শিক্ষা-৩ তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৪) এসো আরবী শিখি- শিশু শ্রেণীর উপযোগী
৫) আল কিরায়াতুল হাদীসা-১, প্রথম শ্রেণীর উপযোগী
৬) আল কিরায়াতুল হাদীসা-২, দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৭) আল কিরায়াতুল হাদীসা-৩, তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৮) আল কিরায়াতুল হাদীসা-৪, চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী
৯) আল কিরায়াতুল হাদীসা-৫, পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী
১০) আল কিরায়াতুল হাদীসা-৬, ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী
১১) আল কিরায়াতুল হাদীসা-৭, সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী
১২) আল কিরায়াতুল জাদীদা-১,
১৩) আল কিরায়াতুল জাদীদা -২,
১৪) আল কিরায়াতুল জাদীদা -৩,

১৫) আমল আখলাক (শিক্ষক গাইড)
১৬) ইসলাম শিক্ষা-১
১৭) ইসলাম শিক্ষা-২
১৮) ইসলাম শিক্ষা-৩
১৯) ইসলাম শিক্ষা-৪
২০) ইসলামিয়াত শিক্ষা-২য় শ্রেণী
২১) ইসলামিয়াত শিক্ষা-৩য় শ্রেণী
২২) আদর্শ ধারাপাত-শিশুর শ্রেণীর উপযোগী
২৩) আদর্শ গণিত-১, প্রথম শ্রেণীর উপযোগী
২৪) আদর্শ গণিত-২, দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযোগী
২৫) তাজবীদ শিক্ষা
২৬) ফোরকানিয়া পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী
২৭) হাদীস সংকলন
২৮) ছোটদের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)- তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী
২৯) আদর্শ পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)- চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী
৩০) ইসলামী শিক্ষা সংকলন
৩১) শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ
৩২) ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা
৩৩) ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি
৩৪) বাংলা পড়া-১, শিশু শ্রেণীর উপযোগী
৩৫) বাংলা পড়া-২, প্রথম শ্রেণীর উপযোগী
৩৬) বাংলা পড়া-৩, দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৩৭) বাংলা পড়া-৪, তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৩৮) বাংলা পড়া-৫, চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী
৩৯) বাংলা ব্যাকরণ, প্রবন্ধ রচনা ও পত্র লিখন-১, চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী
৪০) বাংলা ব্যাকরণ, প্রবন্ধ রচনা ও পত্র লিখন-২, পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী
৪১) বাংলা ব্যাকরণ, প্রবন্ধ রচনা ও পত্র লিখন-৩, ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী
৪২) সরল বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা- সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী

৪৩) A Child's English, শিশু শ্রেণীর উপযোগী
৪৪) English Lessons-Book-I, প্রথম শ্রেণীর উপযোগী
৪৫) English Lessons-Book-II, দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৪৬) English Lessons-Book-III, তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৪৭) English Lessons-Book-IV, চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী
৪৮) Muslim Nursery Rhymes, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী
৪৯) English Grammar, Translation and Composition- Part One, পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী
৫০) English Grammar, Translation and Composition-Part Two, ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী
৫১) Verse for the Crescents Book One–দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৫২) Verse for the Crescents Book Two–তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৫৩) Tales for the Young- I, ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী
৫৪) Tales for the Young- II, সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী
৫৫) Tales for the Young- III, অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী
৫৬) এসো জীবন গড়ি-১, তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী
৫৭) এসো জীবন গড়ি-২, চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী
৫৮) আমাদের প্রিয় নবী- সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী
৫৯) আদ্দুরূসুল আরাবিয়া
৬০) কাওয়ায়েদুল লুগাতিল আরাবিয়া- ১, সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী
৬১) কাওয়ায়েদুল লুগাতিল আরাবিয়া- ২, অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী
৬২) আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ প্রধান শিক্ষক
৬৩) মজার গল্প- ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী
৬৪) ছোটদের নবী-রসূল-১, অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী
৬৫) ছোটদের নবী-রসূল-২, নবম ও দশম শ্রেণীর উপযোগী
৬৬) আসান ফেকাহ (সংকলিত)-৬ষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী
৬৭) নূরুল কাওয়ায়েদ-শিশু শ্রেণীর উপযোগী
৬৮) কিশোর মনে ভাবনা জাগে- সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী

৬৯) বিদ্যালয় প্রশাসন

৭০) On Islamic Education

৭১) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

৭২) আদর্শ পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান), তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী

৭৩) আদর্শ পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান), চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী

৭৪) তা'লীমুল কুরআন

৭৫) Model Word Book-I

৭৬) Model Word Book-II

৭৭) আল-মু'জামুল আরাবী (আরবী ওয়ার্ড বুক)

৭৮) জাতীয় শিক্ষা নীতি ঃ আমাদের বক্তব্য

৭৯) ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৮০) প্রাথমিক সাধারণ জ্ঞান ঃ ৩য় শ্রেণীর উপযোগী

৮১) ছোটদের সাধারণ জ্ঞান ঃ ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর উপযোগী

৮২) সাধারণ জ্ঞান-ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী

৮৩) আঁকতে শিখি-১ শিশু শ্রেণীর উপযোগী

৮৪) আঁকতে শিখি-২ ১ম শ্রেণীর উপযোগী

৮৫) আঁকতে শিখি-৩ ২য় শ্রেণীর উপযোগী

৮৬) আঁকতে শিখি-৪ ৩য় শ্রেণীর উপযোগী

৮৭) আঁকতে শিখি-৫ ৪র্থ শ্রেণীর উপযোগী

৮৮) আঁকতে শিখি-৬ ৫ম শ্রেণীর উপযোগী

৮৯) আঁকতে শিখি-৭ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী

বিঃ দ্রঃ পাঠ্য বইগুলোর মধ্য বেশ কিছু বই বাংলা মাধ্যম কিন্ডার গার্টেন, প্রাথমিক স্কুলসমূহে পড়ানোর জন্য স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। তাছাড়া অনেক ফোরকানিয়া মক্তব, দারসে নিজামী মাদ্রাসা এবং নামকরা স্কুলে বইগুলো পড়ানো হচেছ।

Annex-I

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩. বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়
৪. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৫. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৬. জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
৮. শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
৯. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
১০. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
১১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
১২. বাংলাদেশ শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
১৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
১৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
১৫. হাজী মোঃ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

১. নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
২. ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম
৩. ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
৪. সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি
৫. দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
৬. ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস-এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি (IUBAT)
৭. ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম

৮. আহসান উল্লাহ সাইন্স এন্ড টেকনোলজী ইউনিভার্সিটি

৯. আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (A M A)

১০. কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি

১১. এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

১২. ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

১৩. কুইন্স ইউনিভার্সিটি

১৪. ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ঢাকা

১৫. গণ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১৬. দি পিপল্স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

১৭. ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

১৮. ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

১৯. মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

২০. ভিকারুন্নেসা ইউনিভার্সিটি

২১. বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি

২২. লীডিং ইউনিভার্সিটি

২৩. ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ

২৪. স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি

২৫. বি.জি.সি. ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি

২৬. প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

২৭. সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

২৮. সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি

২৯. ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

৩০. স্ট্যাট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

Annex-II

শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ

১। দারসে কোরআন
২। দারসে হাদীস
৩। আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী
৪। শিক্ষাদানে ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি
৫। শিক্ষাদান পদ্ধতি
৬। পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করণ
৭। ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন
৮। পুস্তক পর্যালোচনা
৯। আদর্শ সমাজ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা
১০। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির উপায়
১১। আরবী ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সহজ পদ্ধতি
১২। আরবী ভাষা শিক্ষাদানের সহজ পদ্ধতি
১৩। ইলমে নাহু শিক্ষাদানের সহজ পদ্ধতি
১৪। ইলমে ছরফ শিক্ষাদানের সহজ পদ্ধতি
১৫। শিশু মন
১৬। বিদ্যালয় প্রশাসন
১৭। হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি
১৮। নথিপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি
১৯। ডেমনস্ট্রেশন ক্লাশ
২০। মূল্যায়ণ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি
২১। কারিকুলাম, সিলেবাস ও টেক্সটবুক
২২। কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি
২৩। সোসাইটি প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের লক্ষ্য
২৪। শ্রেণী শিক্ষক/বিষয় শিক্ষকের দায়িত্ব
২৫। স্বল্প পুঁজিতে স্বাবলম্বি হওয়ার উপায়
২৬। Mother Tongue Interference in English Language
২৭। Teaching of English Pronunciation
২৮। How to teach English Grammar
২৯। Structural Approach to Grammar Teaching
৩০। English language learning Methodology
৩১। Communication Approach to Language Teaching
৩২। বিভিন্ন বিষয়ে গ্রুপ আলোচনা
৩৩। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা
৩৪। বাংলাদেশে এন.জি, ও. কার্যক্রম

তথ্যসূত্র/গ্রন্থপঞ্জী

১। শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী দৃষ্টিকোণ
-মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

২। ইসলামী শিক্ষা সংকলন
-ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

৩। History of Traditional Islamic Education in Bangladesh
-Dr. A.K.M. Ayub Ali

৪। শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
-আবদুস শহীদ নাসিম

৫। Education in Early Islamic Period
-Dr. Zafar Alam

৬। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস
-আব্বাস আলী খান

৭। মাওলানা মওদূদী ঃ একটি জীবন, একটি ইতিহাস, একটি আন্দোলন
-আব্বাস আলী খান

৮। একুশ বছরের রাজনীতি
-আবুল আসাদ

৯। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)
-এম. এ. রহিম

১০। আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস
মূল-আবদুস সাত্তার
অনুবাদ-মোস্তফা হারুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

১১। জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
-আব্বাস আলী খান

১২। মাওলানা মওদূদী ঃ একটি দূর্লভ সংগ্রহ
-মুহাম্মদ শফিউল্লাহ ও মাওলানা হোসাইন আহমদ

১৩। শিক্ষার ইতিহাস
-খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

১৪। Proposals for a New Educational Policy-July, 1969
-Ministry of Education and Scientific Research. Government of Pakistan. Islamabad.

১৫। ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী
-মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

১৬। জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সংকলন, ১৯৯৭
-বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির

১৭। বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ
-বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র

১৮। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর
-আবদুল মওদূদ

১৯। শিক্ষার ইতিহাস কথা
-অধ্যাপক মোহাম্মদ মোমিন উল্লাহ

২০। শিক্ষার ইতিহাস
-অধ্যাপক মোহাম্মদ মোমিন উল্লাহ

২১। মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী
-মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

২২। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে ইসলামী ছাত্র সংঘের ভাষ্য
-প্রকাশনায় আবদুল কাদের

২৩। তাহরীকে দেওবন্দ ঃ দারুল উলূম আন্দোলনঃ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদান
-মাওলানা মুশতাক আহমদ

২৪। জাতীয় শিক্ষানীতি ঃ আমাদের বক্তব্য
-ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

২৫। A Scheme of the Establishment of Islamic Arabic University-
-Preliminary Report-1963

২৬। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস
-আবদূদ দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস